প্রথম আলো
বিশেষ ক্রোড়পত্র
বৃহস্পতিবার, ৭ নভেম্বর ২০২৪ | ২২ কার্তিক ১৪৩১
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২৪

সময়ের সাক্ষ্য

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের দিনগুলো হয়ে উঠেছিল মৃত্যুময়। আন্দোলনরত জনতার ওপর নির্বিচার গুলি করেছে রাষ্ট্রের বাহিনী আর সরকারের পেটোয়ারা। শত শত মানুষ শহীদ হয়েছেন, তবু কেউ পিছু হটেননি। *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা লিখেছেন ভয়ংকর সেসব দিনে তাঁদের কাজ করার অভিজ্ঞতা।

প্রচ্ছদ : আনিসুজ্জামান সোহেল

University of Central Lancashire
UCLan
UCB UNIVERSAL COLLEGE BANGLADESH
An educational initiative of SIS Group

Enhance Your Employability with a UK Degree right here in Dhaka from University of Central Lancashire!

3 Year Bachelor in
Business & Marketing

Flexible study option:
3 Years in Bangladesh or
1 Year in Bangladesh + 2 Years in the UK or
2 Years in Bangadesh + 1 Year in the UK

Ranked in the top 7% of universities worldwide
(The Center for World University Rankings 2023)

Summer School option in the UK

Globally recognised Affordable UK degree in Bangladesh

NOVEMBER 2024 INTAKE
ADMISSIONS OPEN

ENQUIRE FOR ADMISSION:
01844277342-43 | ucbbd.org

Approved by the Ministry of Education
Government of the People's Republic of Bangladesh

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

Spellbound Leo Burnett \ Dhaka Bank \ May 24

ছাত্রছাত্রীরা যখন রাজপথের কবি

সাজ্জাদ শরিফ

কবি; নির্বাহী সম্পাদক, *প্রথম আলো*

‘কবিতা এখন রাজপথে।’ ছাত্র আন্দোলনের মুহুর্মুহু ধাক্কায় রাষ্ট্র যখন কাঁপছে, দেয়ালে দেয়ালে স্লোগানটি লিখে দিয়েছিল ছাত্ররা, ১৯৬৮ সালে, প্যারিসে। পুরোনো পৃথিবী তারা ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল, পুরোনো পৃথিবী তাদের এগোনোর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিকেডের মতো। ছাত্ররা তাই লিখেছিল, ‘ব্যারিকেড রাস্তা বন্ধ করে, কিন্তু খুলে দেয় পথ।’ আগের দুনিয়া তারা ভেঙে ফেলতে চাইছিল নতুন এক দুনিয়ার তৃষ্ণায়। বিপ্লবী রুশ ভাবুক মিখাইল বাকুনিনের একটি কথা খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল তাদের, ‘ভাঙার আবেগ আসলে সৃষ্টিশীল আবেগ।’ ছাত্ররা ছিল সেই আবেগে কাতর। রাজপথে তারা লিখছিল কবিতা—স্বপ্নের আগুন দিয়ে, বিপ্লবী অক্ষরে।

এ বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে ইতিহাসের একই আবর্তন আমরা দেখতে পেলাম, বাংলাদেশের রাজপথে। ছাত্রছাত্রীরা রাজপথে লিখল আন্দোলনের কবিতা, নিজেদের জীবন দিয়ে। মুক্তির স্বপ্নে লাখে লাখে তারা নেমে এল পথে। সরকারের মুখোমুখি দাঁড়াল অদম্য সাহসে। নতুন নতুন চিন্তা ও কৌশলে প্রাণ সঞ্চার করে আন্দোলন টিকিয়ে রাখল। অবশেষে লৌহপ্রতিম সরকারের পতন ঘটিয়ে ছাড়ল।

যতটা সরলভাবে চার-পাঁচ লাইনে গল্পটা বলা হলো, ঘটনা এত সহজ ছিল না। পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পনেরো বছরের বেশি শাসনামলে শুধু কঠোর স্বৈরাচারীই হয়ে ওঠেননি, হয়ে উঠেছিলেন নির্মম এক নিপীড়ক। সীমাহীন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী সব রাজনৈতিক দলকে তিনি দমন করেছিলেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে পদানত করেছিলেন, নিবর্তনমূলক আইনে ও আইনবহির্ভূত পথে গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করেছিলেন।

শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতার চরম রূপটি দেখা গিয়েছিল এই আন্দোলনের সময়ই। তাঁর রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং কয়েকটি বাহিনীকে এই রাষ্ট্রেরই নাগরিকের বিরুদ্ধে ব্যাপক এক হত্যাকাণ্ডে তিনি লিপ্ত করেন। এই হত্যাকাণ্ডের আয়োজন ছিল অকল্পনীয়, ঠিক যেন শত্রুগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রের যুদ্ধ। রাষ্ট্র ও সরকারকে শেখ হাসিনা তাঁর দলের পকেটে রুমালের মতো গুঁজে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা অসম্ভব সাহস দেখিয়ে বেঁকে বসল। তারা শুরু করেছিল সরকারি চাকরিতে অযৌক্তিক কোটাব্যবস্থারই বিরুদ্ধে। কিন্তু শেখ হাসিনার হঠকারিতা ছোট একটি গোষ্ঠীর দাবিকে জনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত কুশলী কর্মসূচি দিয়ে নানা শ্রেণি-পেশা-গোষ্ঠী-বয়সের জনতাকে তাদের সঙ্গে একাত্ম করতে সক্ষম হয়। সবাই নির্ভয়ে বুক পেতে দাঁড়ায় সরকারের নিষ্ঠুর হত্যাযন্ত্রের সামনে। জনতা যখন একটি এককাট্টা রাজনৈতিক সত্তা হয়ে সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে, কার সাধ্য তাকে ঠেকায়। বাকিটা তো ইতিহাস।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্রদের সাহসী উত্থান ঘটেছে বারবার। বিষয়টি আলাদা একটি নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের একটি অভূতপূর্ব তুলনা এ ক্ষেত্রে না করলেই নয়। উনিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রভূমি কলকাতায় মধ্যশ্রেণি গড়ে ওঠার পর রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের মতো বহু আকর্ষণীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা প্রত্যেকে একেকটি ভাবাদর্শ বা সংস্কার-ভাবনার প্রতিনিধি। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ও ভাববস্তুর বারংবার পুনর্বিবেচনার তাঁরা অংশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের যে বদল ঘটে, তার সঙ্গে মিলিয়ে সেখানকার সারস্বত সমাজ এই মনীষীদের নতুন নতুন ভাষ্য হাজির করে, তা আত্মস্থ করে।

পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের ইতিহাস এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এখানে ব্যক্তি নয়, জনতাই প্রধান। ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ এবং সবশেষে ২০২৪ সালই এখানে দ্রষ্টব্য। এসব ইতিহাস-মুহূর্তে ব্যক্তির বদলে জনতাই কর্তাশক্তি। বাংলাদেশের প্রতিটি উজ্জ্বলতম ইতিহাসপর্বে জনতা জেগে উঠেছে। তার চেয়েও বড় কথা, জনতার আন্দোলন রাষ্ট্র, সমাজ বা বৃহত্তর ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। আর এসব আন্দোলনের প্রথম স্ফুরণ সব সময় ছাত্রদের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব। তারাই হয়ে উঠেছে আন্দোলনগুলোর প্রথম চালক।

ছাত্রদের হাত ধরে জনতা জেগে উঠেছে, আর তাতে পাল্টে গেছে ইতিহাস। অথচ সেসব ঘটনা নিয়ে আমরা নিছক স্মৃতিকথা ও সাধারণ ইতিহাসই লিখেছি। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস এবং পাল্টে যাওয়া বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে সেসব ইতিহাসপর্বের ভাববস্তুর পর্যালোচনা বলতে গেলে কখনোই করিনি। আমাদের ইতিহাসের ভাববস্তু তাই বারবার হাতছাড়া হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, ছাত্ররাই কেন রাষ্ট্রের প্রবল মুহূর্তে ঘটনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে?

পৃথিবী চলিষ্ণু। প্রবীণেরা যে পৃথিবীতে বেড়ে ওঠেন, পৃথিবী তার থেকেও এগিয়ে যেতে থাকে। জীবনের যে নতুন সম্পর্ক ও চাহিদা জেগে উঠতে থাকে, তরুণেরাই তার স্পন্দন অনুভব করে সবচেয়ে আগে। পুরোনো ব্যবস্থাকে ভেঙে না ফেললে সেই নতুনকে পাওয়া অসম্ভব। প্রবীণেরা পুরোনো পৃথিবীতে অভ্যস্ত; স্থির জীবনের প্রত্যাশী। তরুণেরা পিছুটানহীন, বেপরোয়া, নিজেদের জন্য নতুন পৃথিবীকে পাওয়ার তৃষ্ণায় দুঃসাহসী। পদে পদে নিষেধের যে বাধা, তার উদ্দেশে তারা বলতে পারে, ‘নিষেধাজ্ঞাই এখন নিষিদ্ধ’, যে আবেগে ছাত্ররা এমন কথা বলেছিল প্যারিসের আন্দোলনে।

ছাত্র আর জনতার সম্পর্কও চমকপ্রদ। যেকোনো ছাত্রই মা-বাবার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার মূর্ত প্রতীক। মা-বাবা ও ছাত্র-সন্তানের সম্পর্ক বিশুদ্ধ আবেগ আর স্বপ্নের। ছাত্র ও জনতার সম্পর্ক তারই এক প্রসারিত চিত্র মাত্র। কোনো ন্যায্য দাবিতে কিশোর-তরুণ ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়লে তার প্রতি জনতার সস্নেহ সমর্থন দেখা যায়, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যেমনটা আমরা দেখেছি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে এই সম্পর্কের আরেকটি মাত্রা বের করা সম্ভব। পাটচাষিদের উদয়াস্ত শ্রমের টাকায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যশ্রেণি একটা ভালো আকার পেতে শুরু করল। তাদের সন্ততিরাই পড়তে এল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ছাত্ররা যখন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করল, পুরান ঢাকার সরদার ও অধিবাসীরা প্রথমে তাতে সমর্থন দেননি। কিন্তু ছাত্রদের বুকে গুলি চালানোর পরে মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা পুরো সমর্থন নিয়ে ওদের পক্ষে চলে আসেন। সন্তানেরা ভুল করতে পারে, তাই বলে ওদের হত্যা করা হবে? এই ছাত্রদের ওপরই কি তাঁরা নিজেদের জীবন বিনিয়োগ করেননি?

স্বাধীনতার আগে-পরে এই ছাত্রদের ভাবাদর্শ ও বিন্যাসের পরিবর্তনও দেখার মতো। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সাধারণভাবে সব ধরনের ছাত্রছাত্রীই অংশ নিয়েছিল। তবে বাম সমাজতান্ত্রিক ধারার ছাত্ররাই প্রত্যক্ষে-প্রচ্ছন্নে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল। তখন স্নায়ুযুদ্ধের কাল। যুক্তরাষ্ট্রের উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া পুরোনো নথিতে এ নিয়ে তাদের সে সময়ের উদ্দেগ লক্ষ করার মতো। স্বাধীনতার আগপর্যন্ত—১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন বা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে—আন্দোলনের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিল বাম গণতান্ত্রিক ধারার ছাত্ররাই। তারা সম্পৃক্তও করতে পেরেছিল জনতাকে। ১৯৮০-র দশকের শেষে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ধসের পরে এই চিত্র পাল্টে যায়। বাম ধারা দেশে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারের পতনের আন্দোলনে সরাসরি ভূমিকায় দেখা গেল মূলধারার রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলোকে।

এবারের চিত্র একেবারেই আলাদা। এবার মূলধারার ছাত্রসংগঠন সেভাবে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তবে সংস্কৃতিযজ্ঞে লিপ্ত রাজনীতির অভিলাষী একদল ছাত্র এ আন্দোলনে নেপথ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের সফলতার পেছনে নানা কারণ ছিল। তাদের ভাষা তরুণদের আকর্ষণ করেছে, বয়ান নানা স্তর ও গোষ্ঠীর মানুষকে যুক্ত করেছে, কৌশল রাষ্ট্রের শক্তি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

যেকোনো অভ্যুত্থানেরই দুটি পর্ব থাকে। একটি পতনের; আরেকটি পত্তনের। প্রথমটি পুরোনোর বিদায়, পরেরটি নতুনের অভ্যুদয়। প্রথমটাই অসম্ভব কঠিন, দ্বিতীয়টা আরও। নতুনের অভ্যুদয় কীভাবে কতটা হবে কিংবা আদৌ হবে কি না, সেটা নির্ভর করবে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে যে জনতার আবির্ভাব ঘটল, ভবিষ্যতে তা কেমন পরিপক্বতা দেখায়, তার ওপর।

তবে পত্তন বা গড়ে তোলার পর্বটি যেদিকেই গড়িয়ে যাক না কেন, ২০২৪ সালের এই আন্দোলনে পতনের পর্বটি যেভাবে সফল হলো, তা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের অংশ হয়ে পড়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা এই সফলতার বড় ভাগীদার। তাদের টুপি-খোলা অভিবাদন।

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ২০২৪

> বিপ্লবী রুশ ভাবুক মিখাইল বাকুনিনের একটি কথা খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল তাদের, ‘ভাঙার আবেগ আসলে সৃষ্টিশীল আবেগ।’ ছাত্ররা ছিল সেই আবেগে কাতর। রাজপথে তারা লিখছিল কবিতা—স্বপ্নের আগুন দিয়ে, বিপ্লবী অক্ষরে।

সরকারি চাকরিতে কোটা নিয়ে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। হাইকোর্টের সামনে। ৩ জুলাই ২০২৪। ছবি : সাজিদ হোসেন

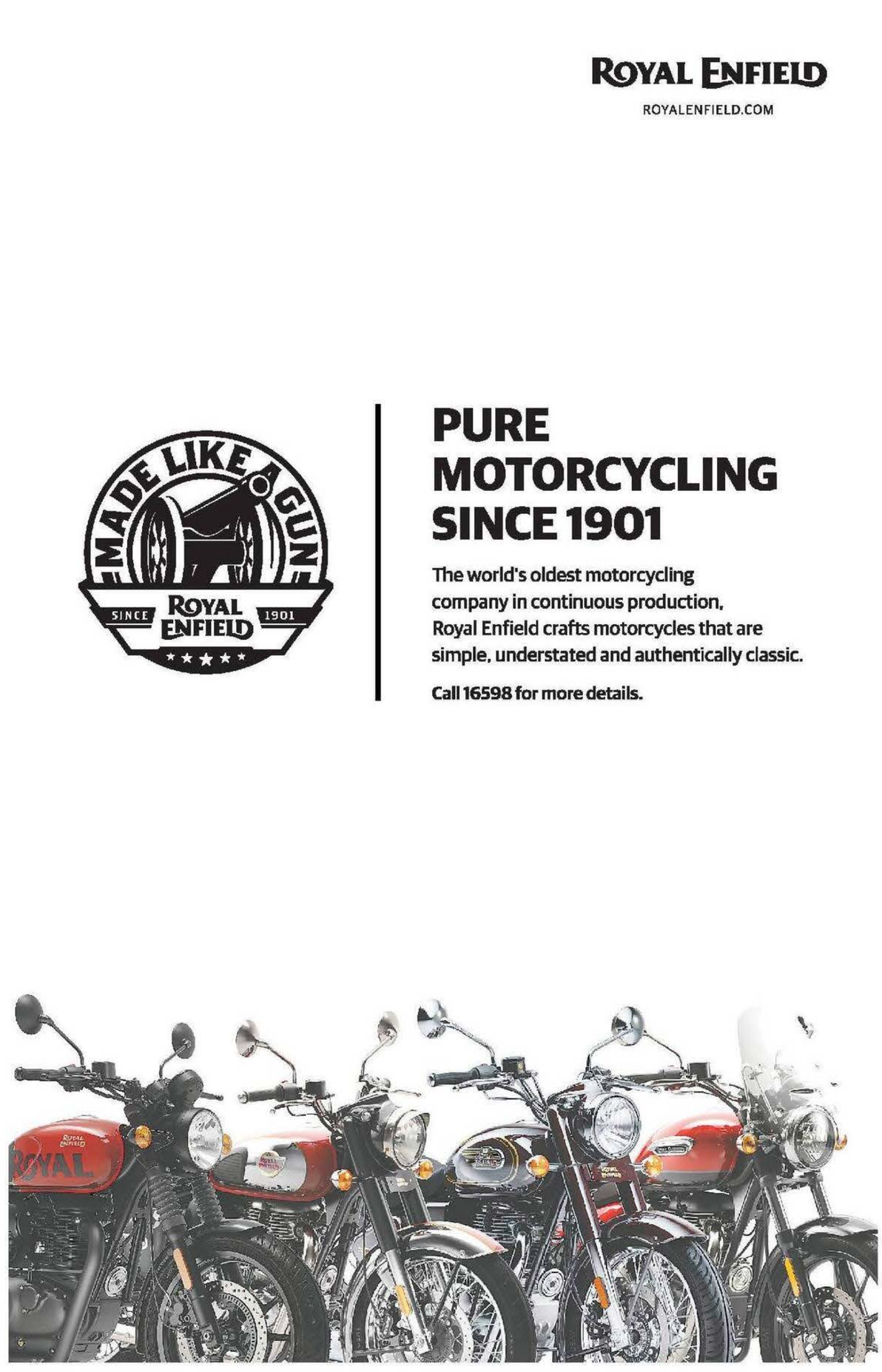

সকল প্রকার লেনদেন করুন রকেট-এ

বাংলাদেশে প্রথম
মোবাইল ব্যাংকিং সেবা

ROCKET
রকেট
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং

বিদেশে থেকেও
লেনদেন করা যায়

NexusPay অ্যাপ-এ
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-এর
ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ড
কোর ব্যাংকিং, রকেট ও এজেন্ট ব্যাংকিং
একাউন্ট অ্যাড করে যে কোন ধরনের লেনদেন ও পেমেন্ট করা যায়
যখন তখন সম্পূর্ণ নিরাপদে
এসকল লেনদেন একদম ফ্রি

CRM Smart Banking
টাকা জমা, উঠানো, পাঠানো যায়
দিন রাত ২৪ ঘন্টা ফ্রি
এসকল লেনদেন একদম

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী

আমরা মৃত্যুর হিসাব রেখেছি

রাজীব আহমেদ, ঢাকা

ডেপুটি হেড অব রিপোর্টিং, অনলাইন, *প্রথম আলো*

দুটি শব্দ মনে আসছে। 'নিরলসভাবে' ও 'বিস্তৃত পরিসরে'। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'রিলেন্টলেসলি' ও 'এক্সটেনসিভলি'। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে মানুষের মৃত্যুর হিসাব রাখতে *প্রথম আলোর* যে প্রচেষ্টা, তাকে এই দুটি শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

জুলাই-আগস্টে মানুষের মৃত্যুর খবরগুলো *প্রথম আলো* রেখেছে। সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইন সংস্করণে প্রকাশ করেছে *প্রথম আলো* এবং পত্রিকায় খবরগুলো প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, *প্রথম আলো* ভুল করেনি।

শুধু নিহতের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ নয়; কারা মারা গেছেন, তাঁদের বয়স কত, পেশা কী, কত শিশু মারা গেছে, কত নারী মারা গেছেন, কত মানুষ বাসায় থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন—এসব তথ্য পাওয়া গেছে *প্রথম আলোয়*। কত মানুষের মরদেহে গুলির চিহ্ন ছিল, কয়জন একটি গুলিতে, কয়জন একাধিক গুলিতে, কয়জন প্রাণঘাতী গুলিতে, কয়জন ছররা গুলিতে বিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই তথ্য *প্রথম আলো* জুলাই ও আগস্ট মাসে বিশ্লেষণ করেছে এবং প্রকাশ করেছে।

> মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহের জন্য মোটাদাগে তিনটি সূত্রের ওপর আমরা নির্ভর করেছিলাম—১. হাসপাতালের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সেখানে মরদেহ নিয়ে আসা মানুষেরা। ২. নিহতদের স্বজন এবং ৩. পুলিশ যদি কোনো মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে।

কাজটি সহজ ছিল না

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত ১৬ জুলাই প্রথম মৃত্যুর (৬ জন) ঘটনা ঘটে। সেদিন রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুলাই ঢাকা আক্ষরিক অর্থেই রণক্ষেত্র। সংঘর্ষ হয়েছে অনেক জেলায়। নির্বিচার গুলিতে মৃত্যুর খবর আসছে। *প্রথম আলোর* নীতি ছিল, আমরা প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করব, অনুসন্ধান করব এবং তা প্রকাশ করব। একই সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নীতি মেনে চলব। মানে হলো, নিজেরা নিশ্চিত না হয়ে একটি মৃত্যুর খবরও দেব না।

মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহের জন্য মোটাদাগে তিনটি সূত্রের ওপর আমরা নির্ভর করেছিলাম—১. হাসপাতালের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সেখানে মরদেহ নিয়ে আসা মানুষেরা। ২. নিহতদের স্বজন এবং ৩. পুলিশ যদি কোনো মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে। আমাদের প্রতিবেদক ও সংবাদদাতা পালা করে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সশরীর থাকতেন। নিহতদের নিয়ে আসা ব্যক্তি, যানবাহনের চালক ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতেন। ৮ আগস্ট পর্যন্ত আমরা এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি। পরে হাসপাতালে কারও মৃত্যু হলে অথবা অন্য কোথাও মৃত্যুর খবর পেলে সেই তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের তালিকা হালনাগাদ করেছি। ঢাকায় আমাদের অন্তত ১৩ জন প্রতিবেদক বিক্ষোভস্থল, হাসপাতাল, স্বজন ও পুলিশের কাছ থেকে নিহত ও আহত মানুষের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের প্রতিবেদকদের একটি দল এক সপ্তাহ ধরে ঢাকার ৩৫টি হাসপাতালে ঘুরেছে। জেলা শহরের হাসপাতাল, পুলিশ ও স্বজনদের কাছ থেকে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন অন্তত ১৩২ জন প্রতিবেদক ও প্রতিনিধি। মাঠ থেকে ছবি তুলেছেন, ভিডিও করেছেন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দায়িত্ব পালন করা আমাদের আলোকচিত্রী ও ভিডিওগ্রাফাররা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে মানুষের মৃত্যুর খবর নিয়মিত প্রকাশ করেছে *প্রথম আলো*। মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঠকদের জানিয়েছে নিহতদের বয়স, পরিচয় ও পেশা। স্বজন হারানো পরিবারগুলো নিয়েও প্রকাশিত হয়েছে মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন। সেই সব প্রতিবেদনের একাংশের কোলাজ।

কাজটি সহজ ছিল না। রক্ত, আর্তনাদ, আহাজারির মধ্যে আমাদের প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসপাতালে অপেক্ষা করেছেন। দায়িত্বশীল ব্যক্তির একটি বক্তব্য পাওয়ার জন্য অবহেলা, অনেক ক্ষেত্রে অপমানও সহ্য করেছেন।

হাসপাতালগুলো সরকারি চাপে মৃত্যুর তথ্য গোপনের চেষ্টা করত। *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। যখন কেউ স্বীকার করত না, তখন ভরসা ছিল হাসপাতালের মৃত্যুনিবন্ধন খাতা।

২৫ জুলাই *প্রথম আলোয়* নিহতের সংখ্যা ২০০ ছাড়ানোর খবর দেওয়া হয় (১৬ জুলাই থেকে)। তখন পর্যন্ত সরকার কোনো মৃত্যুসংখ্যা জানায়নি। আগের দিন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কূটনীতিকদের বলেন, হতাহতের সংখ্যা নিরূপণে সরকার কাজ করছে।

নিহতের সংখ্যা প্রকাশ থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারের চাপ ছিল। গোয়েন্দা সংস্থার ফোন আসত। ফলে বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যম নিয়মিত হিসাবটি প্রচার করত না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যাটি লেখা হলেও তা থাকত প্রতিবেদনের ভেতরে অথবা ভেতরের পাতায়। *প্রথম আলো* নিয়মিতভাবে প্রথম পাতায় মৃত্যুর সংখ্যার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সরকারি বয়ান উড়িয়ে দেয় মৃত্যু বিশ্লেষণ

গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে যখন হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, তখন সরকারের পক্ষ থেকে একটি বয়ান বা ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছিল। সেটি হলো, আন্দোলনকারীরা মূলত বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মী। *প্রথম আলো* মানুষের মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখায়, সরকারের বয়ান আসলে সঠিক নয়।

২৯ জুলাই *প্রথম আলোয়* ১৫০ জনের মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত হয় 'নিহত ১১৩ জন কম বয়সী, শিক্ষার্থী ৪৫' শিরোনামের প্রতিবেদন। আমরা থেমে থাকিনি। ২ আগস্ট ১৭৫ জন নিহতের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত হয়, 'নিহত ৭৮ শতাংশের শরীরে প্রাণঘাতী গুলির ক্ষত'। এই প্রতিবেদনেই উঠে আসে, প্রাণঘাতী গুলির কী ভয়ানক ব্যবহার হয়েছে। ১৪ আগস্ট প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'বাসাও নিরাপদ নয়, গুলিতে মৃত্যু ছয় নারী ও মেয়েশিশুর'। ১৭ আগস্ট আমরা প্রকাশ করি শিশুমৃত্যুর হিসাব। তখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, 'নিহতদের মধ্যে ৬৬ শিশু-কিশোর'। শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যার প্রতিবেদন পরে হালনাগাদ করা হয়।

প্রাণঘাতী গুলির ব্যবহার নিয়ে ২৮ আগস্ট প্রকাশিত হয় 'আইন লঙ্ঘন করে নির্বিচার প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার'।

নিহত ব্যক্তিরা সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা গেছেন, আদালতে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের পুলিশ। সেটা প্রথম ফাঁস করে *প্রথম আলো*। ১ আগস্ট প্রকাশিত হয় 'মানুষের মৃত্যু সন্ত্রাসীদের গুলিতে, বলছে পুলিশ' শিরোনামের প্রতিবেদন। মামলার এজাহার বিশ্লেষণভিত্তিক প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয় যে পুলিশের মামলায় গুলির জন্য সন্ত্রাসীদের দায়ী করা হচ্ছে। আন্দোলনের মুখে গণহারে গ্রেপ্তার নিয়ে ৩১ জুলাই প্রকাশিত হয় 'ঢাকায় গ্রেপ্তার ৮৭ শতাংশের রাজনৈতিক পরিচয় নেই'।

এর বাইরে নিহতদের নিয়ে, তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন করেছেন *প্রথম আলোর* প্রতিবেদকেরা। ১১ বছরের শিশু সাফকাত সাদিয়াকে নিয়ে লেখা 'জানালায় দাঁড়াতেই গুলি এসে কেড়ে নিল শিশুটিকে', সাড়ে ছয় বছরের রিয়া গোপকে নিয়ে লেখা 'বাসার ছাদে বাবার কোলে ঢলে পড়ে ছোট্ট মেয়েটি', সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাহমুদুর রহমানকে (সৈকত) নিয়ে লেখা 'একজন ফোন ধরে বলল, আপনার ছেলে মারে গেছে', নারায়ণগঞ্জের ডিআইইটি রোডে গুলিতে নিহত কিশোর মো. রাসেলকে (১৫) নিয়ে লেখা 'কতই না আর্তনাদ করিছে ছেলে', রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র ফারহান ফাইয়াজকে নিয়ে লেখা, 'এমন জীবন গড়ো, যাতে মৃত্যুর পর মানুষ মনে রাখে', বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) শিক্ষার্থী সীর মাহফুজুর রহমানকে (যুদ্ধ) নিয়ে লেখা 'যুদ্ধদের আন্দোলন তো এখনো শেষ হয়নি'—আরও অনেক প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়েছে।

একটা পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সরকার মানবিক প্রতিবেদন প্রকাশ না করার জন্য চাপ দিয়েছিল। *প্রথম আলো* সেই চাপ উপেক্ষা করে নিহতদের কথা, স্বজন হারানো পরিবারগুলোর কথা তুলে ধরেছে।

শুধু মৃত্যু নয়, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মানুষদের নিয়ে হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে *প্রথম আলো*। ঢাকার ৩১টি হাসপাতাল ঘুরে ২৯ জুলাই *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয় আহতের সংখ্যা নিয়ে একটি প্রতিবেদন। শিরোনাম ছিল, 'আহত ৬ হাজার ৭০৩ জন'। পরে আরও আহতের তথ্য পাওয়া গেছে।

আহতদের নিয়ে 'পেটে গুলি, বুকে গুলি, পায়ে গুলি, কাতরাচ্ছেন তাঁরা', 'গুলিতে চোখ নষ্ট ৪০১ জনের', 'সংঘাতে চোখে গুলি : নতুন বাংলাদেশ নিজের চোখে দেখা হলো না', 'হাত-পা হারালেন ১৯ জন'—এমন অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে *প্রথম আলোর* অনলাইন ও ছাপা পত্রিকায়।

সময়ে সময়ে *প্রথম আলো* নিহত ও আহতের সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ হয়েছে। *প্রথম আলো* এখন পর্যন্ত নিহত ৭৬৬ জনের তথ্য পেয়েছে। সরকার এখন পূর্ণাঙ্গ তালিকা করছে। খসড়া তালিকায় নিহতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে ৮৭২ জন (৩০ অক্টোবর, ২০২৪)।

তাঁরাও 'ট্রমায়'

বাংলাদেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল ছাড়া বিক্ষোভে করা গুলিতে এত মৃত্যু মানুষ দেখেনি। মাঠে থাকা *প্রথম আলোর* তরুণ প্রতিবেদকেরাও নিজ দেশের মানুষের ওপর এত গুলি চালাতে দেখেননি। রক্ত, লাশ, আহাজারি, স্বজনদের কান্না দেখে তাঁরাও 'ট্রমায়' (মানসিক আঘাত) আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে কেউ কেউ হামলার শিকার হয়েছেন। কিন্তু দায়িত্ব থেকে পিছু হটেননি।

সারা দেশে যখন কারফিউ, *প্রথম আলো* কর্তৃপক্ষ নারী সহকর্মীদের বাসা থেকে কাজ করা অথবা ছুটি নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি, নারী সহকর্মীরা ছুটি না নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, কাজ করেছেন।

প্রথম আলোর সব বিভাগ ছিল সক্রিয় ও উদ্যোগী। বার্তাকক্ষ থেকে অনলাইনে দ্রুত পাঠককে খবর দেওয়ার চেষ্টা ছিল। সংবাদ ব্যবস্থাপকেরা সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাতে দফায় দফায় প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাঠকের সাড়াও ছিল অসাধারণ। যেমন আগস্ট মাসে *প্রথম আলোর* অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ পাঠ করা হয়েছে ৩৫ কোটি বার (পেজভিউ)। *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকার পাঠকও বেড়েছে।

সাহসী সাংবাদিকতা চলবে

প্রথম আলো ৪ নভেম্বর ২৭তম বছরে পা দিয়েছে। বিগত ২৬ বছরের মধ্যে *প্রথম আলো* সবচেয়ে চাপে ছিল সাম্প্রতিককালে। সবচেয়ে বেশি চাপের মধ্যে *প্রথম আলো* সেরা সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করেছে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে। নতুন পরিস্থিতিতে *প্রথম আলোর* ওপর নানামুখী চাপ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। কোনো চাপের কাছেই *প্রথম আলো* নত হবে না। বাংলাদেশের স্বার্থে, বাংলাদেশের বিজয়ের জন্য সাহসী সাংবাদিকতা চলবে।

চালান এর মাধ্যমে
এক্সিম ব্যাংকের সকল শাখা ও উপশাখায়
আমাদের আন্তরিক সেবা নিন

আমাদের সেবাসমূহ

- পাসপোর্ট ফি ও জাতীয় পরিচয়পত্র ফি
- পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ফি
- নির্বাচনী জমা
- কোম্পানিসমূহ কর্তৃক দেয় আয়কর
- ব্যক্তিকর্তৃক দেয় আয়কর
- দেশজ পণ্য ও সেবার ওপর মূসক
- আবগারী শুল্ক, কাস্টমস শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক
- দেশজ উৎপাদিত পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক
- কাজের জন্য জমা
- আমদানি পণ্যের উপর মূসক
- নামজারি ও জমাখারিজ ফি
- আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ফি
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি
- ভ্রমণ কর ও ভ্রমণ ব্যয়
- বিজ্ঞাপন কর ও ভূমি উন্নয়ন কর
- দরপত্র দলিল ফি
- অন্যান্য লাইসেন্স ফি
- পরিক্ষা ফি, জরিপ ফি ও কোর্ট ফি
- পেনশন জমা
- বিবাহ নিবন্ধন ফি
- স্ট্যাম্প ডিউটি ও নবায়ন ফি

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246
www.eximbankbd.com

উৎকর্ষের অভিযাত্রায় অনন্যসাধারণ

SK+F

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড

সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ওষুধ সবার আগে

চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবার প্রসারে সদা নিবেদিত

বিশ্বসেরা মাননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত

Major Global Accreditations

AUSTRALIA TGA · UK MHRA · EU GMP · US FDA · BRAZIL ANVISA · SOUTH AFRICA SAHPRA · UK VMD

www.skfbd.com

• রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী নির্দেশিত মাত্রার ঔষধ সেবন করুন • নকল ভেজাল বন্ধ করি, জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করি

শহীদ আবু সাঈদের মরদেব রংপুরের পীরগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে নেওয়ার পর নির্বাক হয়ে বসে আছেন তাঁর বাবা, পাশে আহাজারি করছেন মা। ১৬ জুলাই রাতে, ২০২৪। ছবি : প্রথম আলো

সেদিন শহীদ আবু সাঈদের বাড়িতে

আলতাফ হোসেন

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ, রংপুর, *প্রথম আলো*

১৬ জুলাই। কোটা সংস্কারের দাবিতে সকাল থেকে রংপুরে আন্দোলন চলছিল। বিকেল চারটার দিকে জানতে পারলাম, পুলিশের গুলিতে একজন মারা গেছেন। লাশ আছে রংপুর মেডিকেলে। আমার অবস্থান তখন রংপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে, বদরগঞ্জে। অফিস থেকে বলা হলো, 'আপনি দ্রুত রংপুরে যান, তবে সাবধানে।' সঙ্গে নিহত ছাত্রের পরিচয়-ঠিকানাসহ বিস্তারিত পাঠাল অফিস। জানা গেল, নিহত ছাত্রের নাম আবু সাঈদ। বাড়ি পীরগঞ্জের মদনখালী ইউনিয়নের বাবনপুর গ্রামে। পড়তেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে।

বদরগঞ্জ থেকে রংপুরে পৌঁছাই বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে। তখন অফিস থেকে নির্দেশনা, দ্রুত শহীদ আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে যান। আবার ল্যাপটপ কাঁধে মোটরসাইকেল নিয়ে ছুটলাম আবু সাঈদের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে।

পীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে বাবনপুরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। প্রায় ৯ কিলোমিটার যাওয়ার পর জাফরপাড়া বাজার। সেখানে পৌঁছে দেখি দোকানপাট বন্ধ। সুনসান নীরবতা। ওই বাজার থেকেই বাবনপুরে যাওয়ার সড়কে বাঁক নিতে দু-চারজন মানুষ যা চোখে পড়ল, তাঁদের মধ্যে অজানা এক ভীতি। জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে যাওয়ার পর একজন রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। তখন বিদ্যুৎ ছিল না।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল আন্দোলনের অগ্রনায়ক আবু সাঈদের বাড়ি। তখন সন্ধ্যা সোয়া সাতটা। বাড়ির ভেতরে স্বজনদের আহাজারি বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল। মোটরসাইকেল রেখে সরু গলি ধরে মুঠোফোনের টর্চ জ্বালিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকি। উঠানে কয়েকজন চেয়ারে বসে আছেন। বারান্দায় এক তরুণী বুক চাপড়ে কাঁদছেন। পাশে এক বৃদ্ধা আহাজারি করছেন, 'মোর সোনার বাবাটাক পুলিশ গুলি করিয়া মারল ক্যান। ও তো কাউকে মারতে যায় নাই। চাকরি চাওয়াটা কি অপরাধ? অই পুলিশ, তুই মোকে গুলি করিয়া মারলু না ক্যান?'

তরুণীটি বলছিলেন, 'ও ভাই, তুই হামাক ভাসে থুইয়া কোনটে হারে গেলু। তুই তো কচলু, বইন, মুই চাকরি করলে অভাব থাইকপের নেয়। নেজে কামাই করিয়া কত কষ্ট করি পড়লু। তার ফল কি এইটা?'

বুঝতে বাকি থাকল না ক্রন্দনরত বৃদ্ধা আবু সাঈদের মা আর তরুণী তাঁর বোন।

সংবাদকর্মী হিসেবে মানুষের মৃত্যুর ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে বহুবার। কিন্তু সেদিন আবু সাঈদের মা ও বোনের আহাজারি দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলাম না! এমন শোকাতুর পরিবেশে কারও সঙ্গে কথাও কঠিন। পরে এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানা গেল, সাঈদের মায়ের নাম মনোয়ারা বেগম, বোন সুমি বেগম।

রাতভর সাঈদের বাড়ির ভেতর-বাইরে পায়চারি করতে থাকি। অজানা ভয়ে জড়সড় প্রতিবেশীদের অনেকে ওই রাতে সাঈদদের বাড়িতে আসেননি।

আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী লাশ আনতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেছেন। অন্য ভাইয়েরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না।

আবু সাঈদের লাশের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর মা-বোনসহ অন্যরা। কিন্তু লাশ কখন আসবে, তা কেউ বলতে পারছিলেন না। রাত সাড়ে নয়টার দিকে সাদা পাঞ্জাবি পরা এক ব্যক্তি তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে আসেন। পরিচয় জানালেন, তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ। অন্যজন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন। বাকি দুজন তাঁর সহযোগী। তাঁরা বাড়ির উঠানে কিছুক্ষণ কী সলাপরামর্শ করে চলে গেলেন।

দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কেউ একজন বললেন, লাশ নিয়ে রমজান আলী রংপুর থেকে রওনা হয়েছেন। ফোন করে আমিও নিশ্চিত হই বিষয়টি। এর পরপরই সেখানে ছড়িয়ে পড়ে প্রশাসনের নির্দেশনা—রাতেই লাশ দাফন করতে হবে। রাত দুইটার দিকে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স এসে বাড়ির পাশে থামল। লোকজন অ্যাম্বুলেন্সের কাছে ছুটে গেলেন। লাশ নামিয়ে উঠানে রাখা হলো। এর পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত! স্বজনহারা মানুষের সে-কী আহাজারি!

লাশের সঙ্গে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী। তাঁরা আবু সাঈদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় বাড়ির অদূরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

গভীর রাতে তাৎক্ষণিকভাবে লাশ দাফনের তোড়জোড় শুরু করেন অজ্ঞাত কয়েকজন ব্যক্তি। তখন আবু সাঈদের ভাই রমজান আলী ও শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ রুখে দাঁড়ালে সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অজ্ঞাত লোকজনও সটকে পড়েন। পরে স্বজনেরা সিদ্ধান্ত নেন, সকাল নয়টায় স্থানীয় জাফরপাড়া কামিল মাদ্রাসা মাঠে আবু সাঈদের জানাজা পড়ানো হবে।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে খাবারের খোঁজে পাশের জাফরপাড়া বাজারে যাই। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তখন ১৫ থেকে ১৬টি গাড়িতে সতর্ক পাহারায় দেখা গেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের। আবার আবু সাঈদের বাড়িতে ফিরে আসি।

সূর্যের আলো ফোটার পর থেকে ওই বাড়িতে ভিড় বাড়তে থাকে। সোয়া আটটার দিকে জানাজার জন্য লাশ জাফরপাড়া কামিল মাদ্রাসার মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মাঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পোশাকধারী কেউ না থাকলেও পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইকবাল হাসান উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রুত জানাজা পড়ানোর তাগিদ দেন। উপস্থিত কয়েক শিক্ষার্থী তাঁকে ১৫ মিনিট দেরি করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আবু সাঈদের কয়েকজন সহপাঠী ও শিক্ষক আসছেন। কিন্তু ইউএনও তা নাকচ করে দিলে কিছুটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেই ইউএনও একজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে জানাজার নামাজ পড়ানো শুরু করেন। তখন জানাজার সারিতে দাঁড়ানো অনেকেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন; তাঁরা নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকেন। অবস্থা বেগতিক দেখে জানাজা শেষ করে দ্রুত মাঠ ছেড়ে যান ইউএনও।

পরে আবু সাঈদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক ও কয়েক শিক্ষার্থী আসার পর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে দ্বিতীয় দফায় জানাজা পড়ানো হয়। বাড়ির পাশে দাফন করা হয় আবু সাঈদকে। দাফনের পরও আবু সাঈদের বাড়িতে মানুষ আসছিল। স্বজনদের কান্না থামছিল না।

বেলা ১১টার দিকে যখন আবু সাঈদের গ্রাম ত্যাগ করি, তখন সূর্যটাকে মেঘ খানিকটা আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু সূর্য একসময় ঠিকই সব আড়াল ভেদ করে আলো ছড়ায় চারদিকে। আবু সাঈদও যে 'আলোর ফেরিওয়ালা' হয়ে উঠবেন, জায়গা করে নেবেন ইতিহাসের পাতায়, সেই বার্তাও যেন অলক্ষ্যে কোথাও স্পষ্ট হচ্ছিল...।

ইন্টারনেট সরকারই বন্ধ করেছিল, লিখেছি আমরা

সুহাদা আফরিন, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*

সেদিন ছিল ১০ তারিখ; অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১০ জুলাই। কারওয়ান বাজার থেকে সেগুনবাগিচায় একটি কাজে যেতে হবে। চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি। রাস্তায় নামতেই বোঝা গেল, পুরো শহরটাই স্থবির হয়ে আছে; অর্থাৎ 'বাংলা ব্লকেড' সফল।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে টানা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ৫ জুন থেকে। আন্দোলনে পরিচিত মুখের নেতা ছিল না, দেওয়া হচ্ছিল অভিনব সব নামের কর্মসূচি, একডাকে সব শিক্ষার্থী নেমে আসতেন সড়কে—সব মিলিয়ে এই আন্দোলন ছিল ভিন্ন ধরনের। আন্দোলন চলছিল, সেই সঙ্গে বাড়ছিল হালনাগাদ সংবাদের চাহিদা; অর্থাৎ অনলাইনে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ সংবাদ দিতে হবে। বাধা এল এ কাজে। ১৪ জুলাই মধ্যরাত, খবর এল, কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগ এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাবে। এলাকাটি তখন বিক্ষোভে উত্তাল। রাত দেড়টার দিকে জানা গেল, মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। আন্দোলন দমাতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার নতুন করে শক্তি প্রয়োগ শুরু করে। শিক্ষার্থীদের রক্তাক্ত ছবি ও ভিডিও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ জুলাই দুপুরের দিকে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধের নির্দেশ দেয় সরকার। রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও দেখা দেয় ধীরগতি। ওই দিনই রংপুরে নিহত হন আবু সাঈদ।

বোঝা যাচ্ছিল যে ইন্টারনেটের ওপর আরও খড়্গ নামবে। ঠিক সেটাই হলো। ১৭ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার দিকে সারা দেশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশনা পায় মোবাইল অপারেটররা। তারপরও ১৮ জুলাই আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তখনো রাত ৯টা বাজেনি। হোয়াটসঅ্যাপে এক বন্ধুকে বার্তা পাঠালে তা যাচ্ছিল না। খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে দেশের মানুষ এবার পুরোপুরি ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের শিকার। সংযোগদাতারাও জানান, সরকার ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে।

অনলাইনে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। সবার প্রশ্ন, ইন্টারনেট কবে ফিরবে? সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলককে ফোন দিলে জানালেন, 'মহাখালীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে ডেটা সেন্টার পুড়ে গেছে। কবে নাগাদ ইন্টারনেট-সেবা চালু হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।'

যদিও সংবাদকর্মী হিসেবে জানি যে ডেটা সেন্টারের কোনো ক্ষতিই হয়নি; বরং পাশের দুর্যোগ ভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৮ জুলাই প্রথম আলো অনলাইনে 'সরকারই ইন্টারনেট বন্ধ করেছিল' শিরোনামের প্রতিবেদনে আমরা জানিয়ে দিই, সরকার আসলে মিথ্যা বলছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরে সরকারি তদন্ত প্রতিবেদনেও উঠে আসে যে নির্দেশ দিয়ে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে যে কয়েকটি কথা জনপ্রিয় হয়, তার মধ্যে একটি ছিল 'নাটক কম করো পিও'। এসবই এক 'নাটক' দেখতে ২৩ জুলাই মহাখালীতে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, প্রতিমন্ত্রী 'ক্ষতিগ্রস্ত' ডেটা সেন্টার দেখতে যাবেন। বড় এক বহর নিয়ে পলক মহাখালী যান। ইন্টারনেট বন্ধ করা নিয়ে একেক সময় একেক কথা বলতে থাকেন তিনি। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখেও পড়েন।

টানা পাঁচ দিন দেশকে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন রেখে ২৩ জুলাই ধীরে ধীরে তা সচল করে বিগত সরকার। যদিও সে ইন্টারনেট ছিল কচ্ছপগতির। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকসহ বিভিন্ন বার্তা আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়। অন্যদের ওপর বিধিনিষেধ দিয়েও প্রতিমন্ত্রী পলক কিন্তু নিজে ফেসবুকে সক্রিয় থেকে ঠিকই নিয়মিত পোস্ট দিচ্ছিলেন। টানা ১০ দিন পর চালু হয় মোবাইল ইন্টারনেট। আর ১৪ দিন পর আবার চালু করা হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

এবার শেষ দিনের কথা। ৫ আগস্টে বেলা ১১টার দিকে সংবাদ পাওয়া গেল যে এবার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ পাঠকদের হালনাগাদ তথ্য দেওয়া আবারও বন্ধ। কিন্তু একটু পরই বদলে গেল পরিস্থিতি, 'ব্রেকিং নিউজ'। দুপুরে সেনাপ্রধান বক্তব্য দেবেন। বেলা দেড়টার দিকে চালু হয়ে গেল ইন্টারনেট। কিছু পরে চারদিক থেকে তখন শোনা গেল মানুষের উল্লাসধ্বনি। জানা গেল, বিশেষ এক বিমানে পালিয়ে গেছেন শেখ হাসিনা।

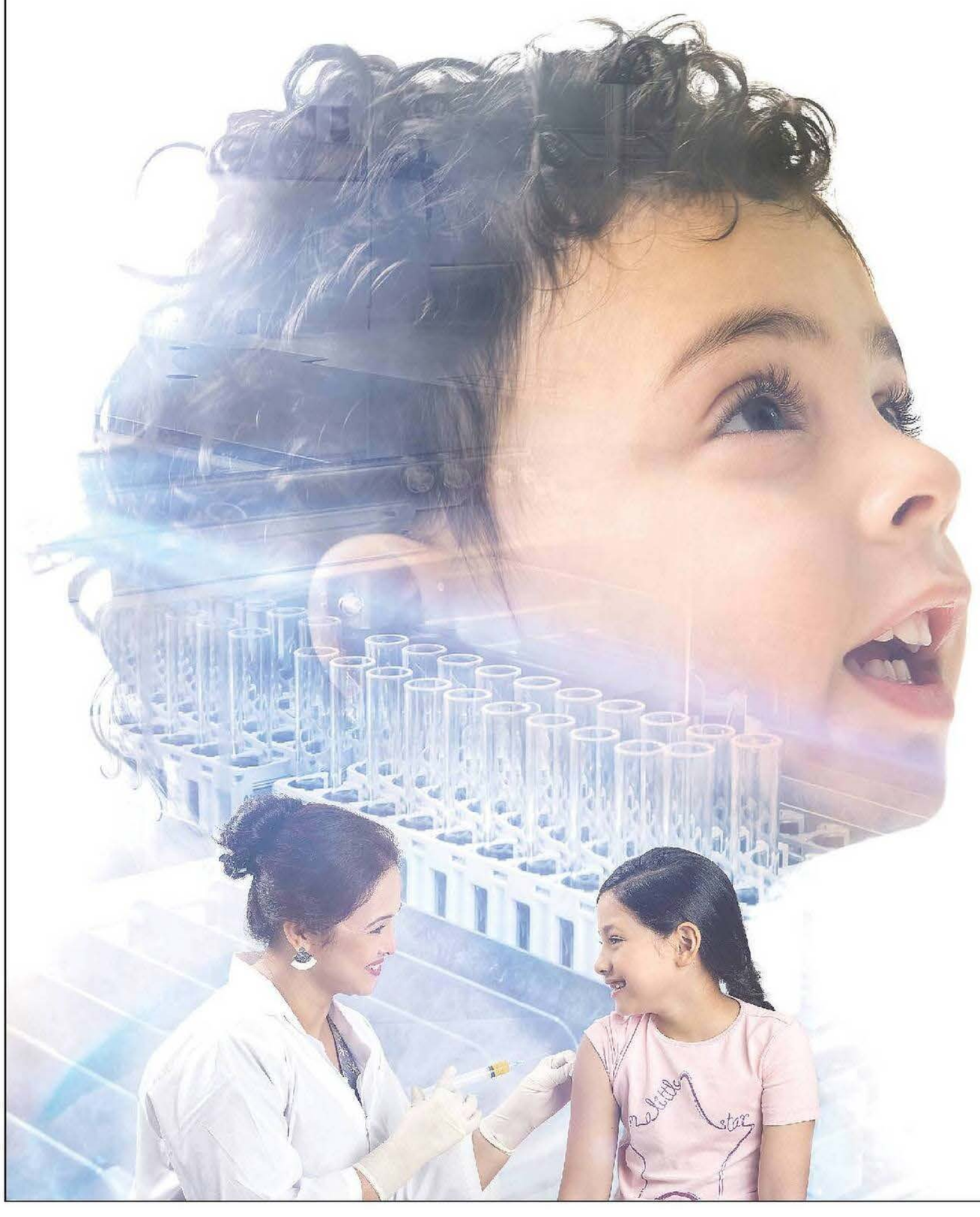

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতার সমাবেশ। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা। ৩ আগস্ট ২০২৪। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

মিছিলের সঙ্গে শহীদ মিনারে

প্রদীপ সরকার, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রতিবাদের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। মিছিলের সঙ্গে দুই দিন আমি গিয়েছিলাম শহীদ মিনারে। আমি দেখেছি, শিক্ষার্থীদের একটি আন্দোলন কীভাবে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

সংবাদকর্মী হিসেবে প্রথম দিন মিছিলের সঙ্গে শহীদ মিনারে গিয়েছিলাম ২ আগস্ট। দিনটি ছিল শুক্রবার। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সেদিন পবিত্র জুমার নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের কর্মসূচি ছিল। বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজের কর্মসূচিও একই স্থানে। বামপন্থী-ডানপন্থীসহ একাধিক সংগঠন গণগ্রেপ্তার বন্ধ ও শিক্ষার্থী-জনতা হত্যার বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হয়। ওই দিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠী উদীচীসহ অনেক সংগঠন প্রতিবাদ সমাবেশ করে।

২ আগস্ট আমার পেশাগত দায়িত্ব ছিল শাহবাগে। সেখানে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা অবস্থান নিয়েছিলেন। বিপুলসংখ্যক পুলিশ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) দিকে সাধারণ মানুষকে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে আমরা কয়েকজন টিএসসির দিকে যাই। তখন টিএসসিতে দেখা হয় সহকর্মী রুবাতুল-আইন-তাহমিনার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মিছিলের সঙ্গে শহীদ মিনারে যাই। গিয়ে দেখি, হাজার হাজার মানুষ।

প্রেসক্লাবের সামনে দায়িত্ব ছিল আমার তখনকার সহকর্মী সামছুর রহমানের। তিনি জানিয়েছেন, নানা সংগঠনের কর্মসূচি ঘিরে বেলা দুইটার আগেই মানুষের ঢল নামে প্রেসক্লাব এলাকায়। লোকে লোকারণ্য প্রেসক্লাবের সামনে কোন সংগঠনের কী কর্মসূচি, তা পৃথক করার সুযোগ ছিল না। একপর্যায়ে পুরো প্রেসক্লাবের সামনের উপস্থিতি একক গণকর্মসূচিতে রূপ নেয়। মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয় ২১টি সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে।

বিপুল মানুষের মধ্যে দেওয়া বক্তব্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলেন। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে শুরু হয় শিক্ষার্থী-জনতার দ্রোহযাত্রা। এটি কদম ফোয়ারা, হাইকোর্ট মোড়, দোয়েল চত্বর, টিএসসি ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যায়।

২ আগস্ট ঢাকা ছিল প্রতিবাদমুখর। ওই দিন জুমার নামাজের পর জাতীয় সসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলটি শাহবাগ পর্যন্ত আসে। ওই দিন বিকেলে 'চলমান পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য সকল পদবির আহ্বান' ব্যানারে ছাত্র আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে গণমিছিল ও সমাবেশ করেন রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএসে বসবাসকারী মানুষ। পরেও তাঁরা মিছিল করেছিলেন।

আগের দিন ১ আগস্ট কোটা সংস্কার আন্দোলনে সরকারের কঠোর দমনপ্রক্রিয়া ও গুলিতে ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদে সকালে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জাতীয় সংসদের সামনে সমাবেশের কর্মসূচি ছিল অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীদের। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই 'দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ'-এর ব্যানারে তাঁরা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর ইন্দিরা রোডের প্রান্তে সমবেত হন। সাধারণ শিল্পীদের অংশগ্রহণ আন্দোলনে নতুন মাত্রা দেয়। অভিভাবকসমাজও একাধিক কর্মসূচি পালন করেছিল।

শহীদ মিনারে ৩ আগস্ট

তত দিনে অনেক ছাত্র-জনতার প্রাণ গেছে। চারদিকে ক্ষোভ-আতঙ্ক। খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষ বাইরে বের হয় না। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেমে নেই। ৩ আগস্ট (শনিবার) বিকেলে আবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কর্মসূচি। সেদিন আমার দায়িত্ব পড়েছিল রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে। ওই দিন দুপুর ১২টায় অল্প কিছু শিক্ষার্থী রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবে দাঁড়ালেন। তাঁদের হাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি ব্যানার। তাতে লেখা 'সারা দেশে ছাত্র-নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা করে খুনের প্রতিবাদ ও ৯ দফা' দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল। জমায়েত বড় হতে শুরু করে। বাড়তে থাকে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা রূপ নেয় বড় জমায়েতে।

বেলা আড়াইটার দিকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্দেশে মিছিল নিয়ে রওনা হন। আমিও তাঁদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করি। নিউমার্কেট হয়ে মিছিল এগোতে থাকে। মিছিল দেখে মার্কেটের দোকানি-ক্রেতারা এসে ফুটপাতে দাঁড়ান। তাঁদের সবার চোখেমুখে যেন বিস্ময়—এত মানুষ! এতক্ষণ ধরে যাচ্ছে, তবু যেন নারী-পুরুষের সেই মিছিল শেষ হচ্ছিল না। আমারও অবাক লাগছিল এই ভেবে যে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে এত মানুষ ছিল!

দোকানকর্মী-ক্রেতা সবাই দাঁড়িয়ে থেকে মিছিলকারীদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন। আন্দোলনকারীরাও ফুটপাতে থাকা মানুষের মিছিলে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

মিছিলটি যখন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রবেশ করে, সেখানে এত মানুষ ছিল যে মনে হলো সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে আসা মিছিলটি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সাগরে নদীর মিশে যাওয়া যেমন হয়।

এর কিছুক্ষণ পর রাজধানীর ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবর থেকে ব্যান্ড সংগীতশিল্পীদের নেতৃত্বে একটি মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসে। ব্যান্ড সংগীতশিল্পীদের মিছিল যে অংশ দিয়ে শহীদ মিনারে প্রবেশ করে, সেখানে রিকশাচালকেরা অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন। তখন শহীদ মিনারের এমন অবস্থা যে জায়গাটি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত—সব শ্রেণির মানুষের বিশাল এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। শহীদ মিনার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, দোয়েল চত্বর, পলাশীসহ আশপাশের এলাকা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

স্লোগানে প্রকম্পিত ছাত্র-জনতার জমায়েতের কেন্দ্র শহীদ মিনারে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উপস্থিত হন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক। সবার দাবি জানতে চান তাঁরা। সবাই সমস্বরে এক দফা দাবির কথা জানান। 'ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থান, অভ্যুত্থান', 'পদত্যাগ পদত্যাগ, শেখ হাসিনার পদত্যাগ' এমন স্লোগান ওঠে চারপাশে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এক দফার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এক দফা দাবির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। দফাটি হলো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ এই সরকারের পতন ও ফ্যাসিবাদের বিলোপ।' পরদিন রোববার থেকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণাও তুলে ধরেন তিনি।

শহীদ মিনারে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি যেমন সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল; তেমনি পুরুষের পাশাপাশি ছিল বিপুলসংখ্যক নারীর উপস্থিতি। সব শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিই যেন বলে দিচ্ছিল, সামনে কী হতে যাচ্ছে।

৫ আগস্ট আমরা দেখলাম, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলো।

যাত্রাবাড়ীর প্রতিরোধে

আসাদুজ্জামান, ঢাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, প্রথম আলো

ইটের টুকরা হাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাজলায় স্লোগান দিচ্ছিল কিশোরটি। তখন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি ছুড়ছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর সদস্যরা। ইট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরের বুকের বাঁ পাশে হঠাৎ এসে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। তখন আরেকজন আন্দোলনকারী তাকে কাজলার অনাবিল ও সালমান হাসপাতালে নিয়ে যান।

কাজলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ছোড়া গুলি মিনিটে মিনিটে আন্দোলনকারীদের শরীরে বিঁধছিল। আহত আন্দোলনকারীদের হাসপাতালে রেখে আবার কাজলার রোডে ফিরছিলেন সহযোদ্ধারা। ছাত্র-জনতা জীবনবাজি রেখে রাস্তায় গিয়ে গুলিতে হতাহতের ঘটনার শুরু ১৭ জুলাই সকাল ১০টায়। জুলাই (১৭ জুলাই-২২ জুলাই) ও আগস্টের (৩ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট) দুই দফায় আট দিনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চার কিলোমিটার এলাকায় অস্ত্র ও গুলির মুখে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ছাত্র-জনতা।

এই ছাত্র-জনতার মধ্যে শিক্ষার্থীরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছিলেন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা। ইসলামী আন্দোলন এবং হেফাজতে ইসলাম-সমর্থিত বিভিন্ন ইসলামি দলের কর্মী ও সমর্থকেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসার শিক্ষার্থী যাত্রাবাড়ীতে প্রতিরোধে অংশ নেন। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে (১৭ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট) সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সাধারণ শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা শহীদ হন। শুধু যাত্রাবাড়ী নয়, আন্দোলনের এই চিত্রটি ছিল অনেক জায়গায়।

যাত্রাবাড়ীতে প্রতিদিনই মানুষের মরদেহ সড়কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গলিতে থেকেও গোয়ালবাড়ী মোড়সহ কয়েকটি স্থানে গুলিতে নিহত অন্তত ১০ জনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন স্থানীয় লোকজন।

যেন যুদ্ধ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী হচ্ছে ঢাকার প্রবেশদ্বার। যাত্রাবাড়ী থানা ঘেঁষে রয়েছে দেশের বৃহত্তম মাছ ও ফলের আড়ত। ফলের আড়তের উল্টো দিকে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসাও রয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ঢাকাসহ সারা দেশে গত ১৬ জুলাই ছয়জন নিহত হন। পরদিন সকাল ছয়টার পর দনিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শনির আখড়া ও কাজলা অংশ অবরোধ করেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত কাজলা থেকে সাইনবোর্ড পর্যন্ত ছাত্র-জনতার দখলে ছিল।

সন্ধ্যার পর কাজলায় হানিফ উড়ালসড়কের টোল প্লাজা থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত মহাসড়কের অন্তত ৪০টি স্থানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শুরু হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র-জনতার পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। সন্ধ্যার দিকে একদল পুলিশ সদস্য অনাবিল হাসপাতালের গলিতে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি করেন। ওই সময় সেখানে দাঁড়ানো ইসরান বাবুর্চির মাথায় গুলি লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাতভর পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

১৮ জুলাই শুরু হয় ভয়াবহ পরিস্থিতি

যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ১৮ জুলাই বিপুলসংখ্যক পুলিশ, র‍্যাব ও এপিবিএন সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় মোতায়েন। আন্দোলনকারীরা থানার কাছে সড়ক দখল করে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। মাছের আড়তে ঘুমিয়ে থাকা এক কর্মচারীর মাথায় গুলি লাগে। ঘুমের মধ্যে চিরঘুমে চলে যান তিনি।

পুলিশের গুলি আর সাউন্ড গ্রেনেডের মুহুর্মুহু শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। তখন পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে কাজলার উড়ালসড়কের কাছে পেশাগত দায়িত্ব পালনরত ঢাকা টাইমস-এর সাংবাদিক মেহেদি হাসানের বুক ঝাঁজরা হয়ে যায়। গুলিতে হতাহত মানুষের ঠাঁই হয় হাসপাতালে। ১৮ ও ১৯ জুলাই কেবল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পড়ে ছিল অনেকের মরদেহ।

সড়কে মরদেহ

আবার ৩ আগস্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চার কিলোমিটার মহাসড়ক দখল করে নেন ছাত্র-জনতা। শুরু হয় র‍্যাব-পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের তুমুল সংঘর্ষ। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন সকাল ১০টার দিকে হাজারো ছাত্র-জনতা কাজলায় অবস্থান নেন। বেলা ১টার পর পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে যাত্রাবাড়ী থানার সামনের সড়কে এক পাশে লুকিয়ে থাকা ৩০ থেকে ৩৫ জন আন্দোলনকারীকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এসব মরদেহ অনেকক্ষণ যাত্রাবাড়ী থানার সামনের সড়কে পড়ে ছিল। পরে শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিকেল চারটার পর আন্দোলনকারীরা মরদেহগুলো ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান।

এত মরদেহ, এত মৃত্যু, এত আহাজারির কথা আজও যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, রায়েরবাগ এলাকার মানুষের মুখে মুখে। এসব এলাকার সড়ক-গলিতে কত মানুষের মৃত্যুর গল্প জমে আছে!

উত্তরা থেকে গণভবনমুখী জনস্রোত

সেলিম জাহিদ, ঢাকা

বিশেষ প্রতিনিধি, *প্রথম আলো*

৫ আগস্ট সোমবার। সেদিন ছিল 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি। আগের দিন সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা আত্মগোপনে থেকে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন। তখনো রাস্তায় গোলাগুলি ও সংঘর্ষ চলছিল। খবর আসছে শত শত মানুষের মৃত্যুর। কিন্তু পিছু হটছিল না ছাত্র-জনতা। রাজধানীর উত্তরা, রামপুরা, যাত্রাবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকা আন্দোলনের 'হটস্পট' হয়ে উঠেছে। হঠাৎ করেই 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি এক দিন এগিয়ে আনার ঘোষণা এল। তখন অনেকের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল এ কর্মসূচি নিয়ে।

আমার বাসা রাজধানী ঢাকার দক্ষিণখানে। যে এলাকার ছোট-বড় সব রাস্তাই কাটা। আমরা প্রতিদিন খানাখন্দ, এবাড়ি-ওবাড়ির কাদাপানিতে ভরা চিপা গলি দিয়ে চলি। সে এক দুর্গম যাত্রা। দক্ষিণখান থেকে উত্তরায় পৌঁছাতে মোটামুটি ঘণ্টাখানেক পথ।

আন্দোলন যখন তুঙ্গে, অফিস মনে করল, এই সময়ে হটস্পট উত্তরায় দায়িত্ব পালনই আমার জন্য ভালো দুদিক থেকে। সঙ্গে সহকর্মী *প্রথম আলোর* গাজীপুর সংবাদদাতা আল-আমিন। দুজনে সমন্বয় করে আমরা বিক্ষোভ-সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করি।

উত্তরা ছিল নিরিবিলি এলাকা। অতীতের আন্দোলনে বিএনপি বা জামায়াত কখনো সেভাবে রাস্তায় দাঁড়াতে পারেনি। ১৬ জুলাই প্রথম আজমপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে ছাত্ররা উত্তরা দখলের জানান দিলেন। পরদিন ছিল পবিত্র আশুরার ছুটি। ১৮ ও ১৯ জুলাই ছাত্রদের দখল ভাঙতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা একযোগে হামলা চালান। তুমুল সংঘর্ষে মারা যান অনেক ছাত্র ও সাধারণ মানুষ। মূলত এই দুই দিনে ছাত্রদের অদম্য প্রতিরোধেই উত্তরায় ক্ষমতাসীনদের ভিতে কাঁপুনি ধরে।

১৯ জুলাই দিবাগত রাত থেকে জারি হয় কারফিউ। কারফিউ ভেঙেই প্রতিদিন সকাল থেকে ছাত্ররা বিক্ষোভ করেছেন। এর মধ্যে পুলিশ-এপিবিএনের গুলি, কাঁদানে গ্যাস, ক্ষমতাসীনদের সশস্ত্র হামলায় ছাত্ররা কখনো পিছু হটেছেন, আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তবে আজমপুরে 'বিএনএস সেন্টার' এলাকাটি আগাগোড়াই ছাত্রদের দখলে ছিল।

ঘটনা ১

যে রাতে কারফিউ ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ ১৯ জুলাই দিবাগত রাত সোয়া দুইটার দিকে আমার মুঠোফোনে রিং। অপ্রস্তুত ও আঁতকে উঠলাম। বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত, শয্যাশায়ী। নিশ্চয়ই আম্মা বা ভাইবোনদের কারও ফোন। কিন্তু স্ক্রিনে ওঠা নম্বরটি অপরিচিত। পরিচয় দিয়ে জানালেন, একজনকে রাত একটার দিকে ধানমন্ডির বাসা থেকে তুলে নিয়ে গেছেন কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের সদস্যরা। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ। ব্যবসায়ী। অভিযোগ, আন্দোলনে অর্থের জোগানদাতা। পরে তাঁর কাছ থেকে জেনেছি, আটক হওয়ার আগে ফোনে শেষ কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে। অন্য আরও অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁর দুটো ফোন পুলিশ জব্দ করে। স্ত্রীকে বলে গেছেন খবরটি, যেন আমাকে জানানো হয়। আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হতো, অনেক তথ্য দিতেন।

আগের দিন ১৮ জুলাই মধ্যরাতে ফোনে ওই ব্যবসায়ী জানিয়েছিলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে বেশ কিছু লাশ আছে। আমরা যেন খোঁজ নিই। কিছুটা সন্দেহ নিয়েই এত রাতে অফিসকে জানাই। সত্যিই, আমার এক সহকর্মী গিয়ে রক্তাক্ত মরদেহগুলোর সন্ধান পান। ওই ব্যবসায়ী ১৯ জুলাই মধ্যরাতে ফোনে জানান, যাত্রাবাড়ী এলাকার অনাবিল হাসপাতাল, বাড্ডার এমএমজেড হাসপাতাল ও আরেকটি হাসপাতালে বেশ কিছু মরদেহ আছে। তখন পর্যন্ত হাসপাতালের কাগজপত্র ছাড়া লাশের 'সংখ্যা' প্রকাশ করা বেশ কঠিন ছিল। সেই রাতে যাচাই করতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরে হাসপাতাল তিনটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে মানুষের মৃত্যুর সত্যতা পাওয়া যায়।

মুক্তি পাওয়ার পর ওই ব্যবসায়ী আমাকে বলেছেন, জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ তাঁর কাছে শেষ কলের ব্যক্তিকে (আমার) দেওয়া তথ্য এবং আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।

ঘটনা ২

২৩ জুলাই রাত ৯টার দিকে বাসা থেকে আমার বড় ছেলের ফোন। আব্বু, তোমার খোঁজে একজন বাসায় এসেছিলেন। এটা সাংবাদিক সেলিম জাহিদের বাসা? ছেলে 'হ্যাঁ' বললে ওই ব্যক্তি জানতে চান, আমি কোথায়। ছেলে বলল, বাসায় নেই। ছেলে মাকে ডাকল। মা এলে ওই ব্যক্তির প্রশ্ন, আমি কখন বাসায় ফিরি, সকালে কখন বের হই। তিনি রাজশাহী থেকে এসেছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে আমার মুঠোফোন নম্বরটিও নিলেন। বসতে বললে ভদ্রলোক বসেননি। বলে গেলেন, আবার আসবেন। ছেলে বলল, 'লোকটির কথাবার্তা কেমন-কেমন লেগেছে। তুমি সাবধানে আইসো।'

ঘটনাটি হেড অব রিপোর্টিংকে জানালাম। এ পরিস্থিতিতে বাসায় যাব কি না, দোটানায়। মনস্থির করলাম যাব। কারণ, আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। রাত ১২টার কিছু পরে ভয়ে ভয়ে দক্ষিণখানে ফিরি আমার মোটরসাইকেলে। দূর থেকে দেখি, ঠিক বাসার সামনে হেলমেট পরা এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলের ওপর বসা। আমাদের বাড়ির নিরাপত্তাকর্মী তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে দেখে দ্রুত গেট খুলে দিলে আমি ভেতরে ঢুকি। নেপেই নিরাপত্তাকর্মীকে বললাম, লোকটি কে। বলল, সে চেনে না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বসে আছে, মুঠোফোনে কথা বলছে। আরও জানাল, সন্ধ্যার দিকে দুজন লোক এসেছিল। তারা জানতে চেয়েছে, আমি কখন আসি।

ছেলের ফোন, নিরাপত্তাকর্মীর তথ্য জেনে মুহূর্ত দেরি না করে বের হয়ে গেলাম। তখনো লোকটি মোটরসাইকেলেই বসা। আমি যখন বের হচ্ছি, লোকটি ফোনে কথা বলছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে। একটু আড়াল হতেই মোটরসাইকেল স্টার্টের (চালু) আওয়াজ। মুহূর্তের মধ্যে লোকটিও মূল সড়কের দিকে গেলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে আমি আর বাসায় থাকলাম না।

পরদিন বেলা ১১টার দিকে নিরাপত্তাকর্মীর স্ত্রীকে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, সাংবাদিক বাসায় আছে কি না। এরপর কয়েক দিন আর বাসায় যাওয়ার সাহস করিনি। দু-চারজন ছাড়া কাউকে কিছু না বলে একরকম আতঙ্কের মধ্যেই অফিস করি। ভাবছি আর ঘটনা মেলাচ্ছি, কোত্থেকে কী হচ্ছে। বাইরে আর ভালো লাগছিল না। চার দিন পর বাসায় ফিরলাম।

অগ্নিগর্ভ উত্তরায় মারা গেলেন ৫৮ জন

১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরায় যেন রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। এর মধ্যে ২৬ জুলাই পর্যন্ত উত্তরার সাত হাসপাতাল ঘুরে আসরা ২৯ জনের মৃত্যুর খবর পাই। ৫ আগস্ট বেলা তিনটার দিকে যখন চারদিকে বিজয়ের মিছিল, উত্তরা পূর্ব থানা ঘিরে তখনো উত্তেজনা। সে সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান আরও ২৩ জন। এর রেশে রাতে আবার থানায় হামলা হয়। মারা যান আরও ছয় পুলিশ সদস্য। সব মিলিয়ে মৃত মানুষের সংখ্যা ৫৮।

মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে অংশ নিতে গাজীপুরের মাওনা থেকে এসেছিলেন এক পরিচিতজন। ৫ আগস্ট সকাল ৯টার দিকে যমুনা ফিউচার পার্কের পাশ থেকে ফোনে জানান, ছাত্ররা জড়ো হচ্ছেন। একটু পর জানালেন, গুলি করা হচ্ছে, কয়েকজন মারাও গেছেন।

আমি উত্তরায় গেলাম। ১১টার দিকে শুরু হলো ঢাকামুখী মার্চ। ঘণ্টাখানেক দাঁড়ালাম। সময় গড়াতেই খবর ছড়াল, সেনাপ্রধান টেলিভিশনে বক্তব্য দেবেন। বাঁধভাঙা জোয়ার নামল রাস্তায়। বিমানবন্দর সড়কে তখন ঢাকামুখী মানুষের ঢল। মোটরসাইকেল চালানো দুষ্কর। উল্টো পথের সড়কটি একটু ফাঁকা। বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পার হয়ে উল্টো পথে রওনা দিলাম কারওয়ান বাজারে অফিসের দিকে। এক ছাত্র এসে বায়না ধরলেন, তাঁকে যেন সঙ্গে নিই।

মোটরসাইকেলের পেছনে বসে ছেলেটির সেকি উচ্ছ্বাস! নাম-পরিচয় বলেছিল, ভুলে গেছি। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল পার হওয়ার পর পথে পথে পানির বোতল, চকলেট, চুইংগাম, আইসক্রিম, কোমল পানীয় হাতে অসংখ্য মানুষ। দুহাতে বিলাচ্ছেন হাসিমুখে। বনানী, মহাখালী, জাহাঙ্গীরগেট হয়ে মোটরসাইকেল যখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে এল, দেখি কোনো নিরাপত্তা পাহারা নেই। গেট খোলা। পাশেই সেনাবাহিনীর দুটি গাড়ি আছে। উৎসুক দু-চারজন ভেতরে ঢুকছেন, কেউ বাধা দিচ্ছে না।

একটু এগিয়ে বিজয় সরণি মোড়। এখানে এসে দেখা গেল, পেছন থেকে আসা মানুষগুলোর স্রোত সংসদ ভবনের দিকে। বিজয় সরণি হয়ে আমরা ফার্মগেটের দিকে। মোটরসাইকেল আর যেন এগোচ্ছেই না। ফার্মগেটের খামারবাড়ি ট্রাফিক মোড়ে এসে আর পারলাম না। পিঁপড়ার সারির মতো মানুষের স্রোত আর স্রোত। সেই সঙ্গে স্লোগান আর স্লোগান।

'পালাইছে রে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে' —এ স্লোগানই ছিল মুখে মুখে। বাঞ্ছাবিক্ষুব্ধ মিছিলের ঢলে আটকে পড়লাম। প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষার পর ছেলেটি 'থ্যাংক ইউ' বলে বিদায় নিল। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম আরও ঘণ্টাখানেক।

আন্দোলনকারীদের সড়ক অবরোধ। উত্তরা, ঢাকা। ১৯ জুলাই, ২০২৪। ছবি : খালেদ সরকার

এখনো কানে বাজে, 'ভাই, আমারে বাঁচান'

আল-আমিন, গাজীপুর

প্রতিনিধি, গাজীপুর, *প্রথম আলো*

আন্দোলনের কথা মনে করতে গেলেই চোখে ভাসছে পুলিশের নির্বিচার গুলি, হাসপাতালে আহত মানুষের ঢল, বাসিন্দাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তার গল্প। তাই কোনটা রেখে কোনটা লিখব বা কোনটা লিখলে কোনটা বাদ পড়ছে, তা-ই ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না।

আন্দোলনের খবর সংগ্রহে আমি ছিলাম রাজধানীর উত্তরায়। ঢাকার যে কটি জায়গায় বড় বা সংঘাতময় আন্দোলন হয়েছে, তার একটি উত্তরা। এখানে কাজ করতে গিয়ে কখনো বিচলিত হয়েছি, কখনো ঝুঁকির মধ্যে পড়েছি, কখনোবা ভেঙে পড়েছি মানসিকভাবে। তারপরও মাঠে ছিলাম আন্দোলনের পুরোটা সময়।

১৮ জুলাই সন্ধ্যা ছয়টা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পিছু হটেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য। কিছু পুলিশ সদস্য উত্তরা পূর্ব থানা পাহারায় অবস্থান নেন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে। ততক্ষণে পুলিশের গুলিতে আহত ও নিহত শিক্ষার্থীর খবর ছড়িয়েছে। প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছেন আশপাশের এলাকার হাজারো মানুষ। তাঁরা থানা ঘেরাওয়ের চেষ্টা করছেন। পুলিশ ছুড়ছে মুহুর্মুহু গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল।

আমি তখন ঠিক বিএনএস সেন্টারের সামনে। পুলিশের নির্বিচার ছোড়া গুলিগুলো পাতলা শব্দ হয়ে ভেসে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে, মনে হচ্ছে এই বুঝি লেগে গেল। বাতাসে কাঁদানে গ্যাসের তীব্র ঝাঁজ। সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দে কান ঝালাপালা অবস্থা। আমি এর মধ্যেই ছবি তোলার জন্য এগিয়ে যাই ঘটনাস্থলের দিকে।

আশ্রয় নিই আজমপুর পদচারী-সেতুর পূর্ব পাশের সিঁড়ির নিচে। পদচারী-সেতু আর পূর্ব থানার দূরত্ব আনুমানিক ১৫০ মিটার। পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। এর মধ্যেই হঠাৎ চোখ আটকে যায় শাহজালাল অ্যাভিনিউ সড়কের মাথায়। সেখানে পড়ে আছেন গুলিবিদ্ধ এক যুবক। 'ভাই, আমারে বাঁচান' বলে চিৎকার করছেন। কিন্তু পুলিশের গুলির মুখে কেউ এগোতে পারছেন না। পরে জেনেছিলাম, তাঁকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। চোখ বন্ধ করলেই মনে পড়ে সেই স্মৃতি। এখনো কানে বাজে ওই যুবকের 'ভাই, আমারে বাঁচান' আকুতিটি।

১৮ জুলাই। বেলা একটার দিকে আহত বা নিহতের খবর নিতে আমি যাই উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তখনো পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। মূল ফটক পেরিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রবেশ করতেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। একের পর এক আহত রোগী আসছেন। তাঁদের অধিকাংশই গুলিবিদ্ধ (প্যালেট)। নার্সরা দ্রুত তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। জরুরি বিভাগের ধারণক্ষমতা শেষ। অনেকে পড়ে আছেন হাসপাতালের সিঁড়ে, বারান্দা ও সামনের ফাঁকা জায়গায়। একই চিত্র ছিল উত্তরা ক্রিসেন্ট ও বাংলাদেশ-কুয়েত হাসপাতালে।

একটি সাউন্ড গ্রেনেড ও আমার বেঁচে ফেরা

১৯ জুলাই, শুক্রবার। জুমার নামাজের পর আবারও শুরু হয় সংঘর্ষ। এর মধ্যেই বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে খবর আসে হাউস বিল্ডিং এলাকায় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম। আমি ছুটলাম ঘটনাস্থলের দিকে।

বিক্ষোভ তখন ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরার অলিগলিতে। নানা বাধা পেরিয়ে বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে পৌঁছাই উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে। দেখি, সেখানে একটি বটগাছের নিচে পড়ে আছে এক ব্যক্তির লাশ। বলাবলি হচ্ছিল, নিহত ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের পিএস (একান্ত সচিব)। একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুঠোফোনে একটি ছবি তুলেছি। এর মধ্যেই পেছন থেকে লাঠি হাতে কয়েকজন তরুণ আমাকে ঘিরে ধরেন। কোনো কথা না বলেই শুরু করেন কিলঘুষি। একপর্যায়ে একজন রড হাতে এগিয়ে আসে আমার দিকে। আমাকে মাথায় বাড়ি দেবে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ সাউন্ড গ্রেনেডের বিকট শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় সবাই। আমিও দৌড়ে প্রাণ বাঁচাই।

সময়ের সেরা বিনিয়োগে
লাখে হাজার টাকা
প্রতি মাসে

"মান্থলি ইনকাম ডিপোজিট স্কিম" -এ আছে
- ১২% পর্যন্ত আকর্ষনীয় ইন্টারেস্ট রেট
- ৫০,০০০ টাকা বা এর যেকোন গুণিতক পরিমাণ ডিপোজিটের সুযোগ
- মাসে মাসে মুনাফা তুলে নেওয়ার সুবিধা

১৬২০৭
abbl.com
AB Bank

১২ মাস পর্যন্ত ইএমআই সুবিধা

BRAC BANK | Eastern Bank PLC | Mercantile Bank Limited | aibl | Jamuna Bank
MTB | Prime Bank | MEGHNA BANK | DHAKA BANK PLC. | COMMERCIAL BANK
UNITED COMMERCIAL BANK PLC | UCB | ONE Bank | NCC Bank | Standard Bank Limited | Community Bank
NRB Bank | Bank Asia | AB Bank

09 678 777 777
info@hatil.com
www.hatil.com
হাতের মুঠোয় হাতিল
HATIL

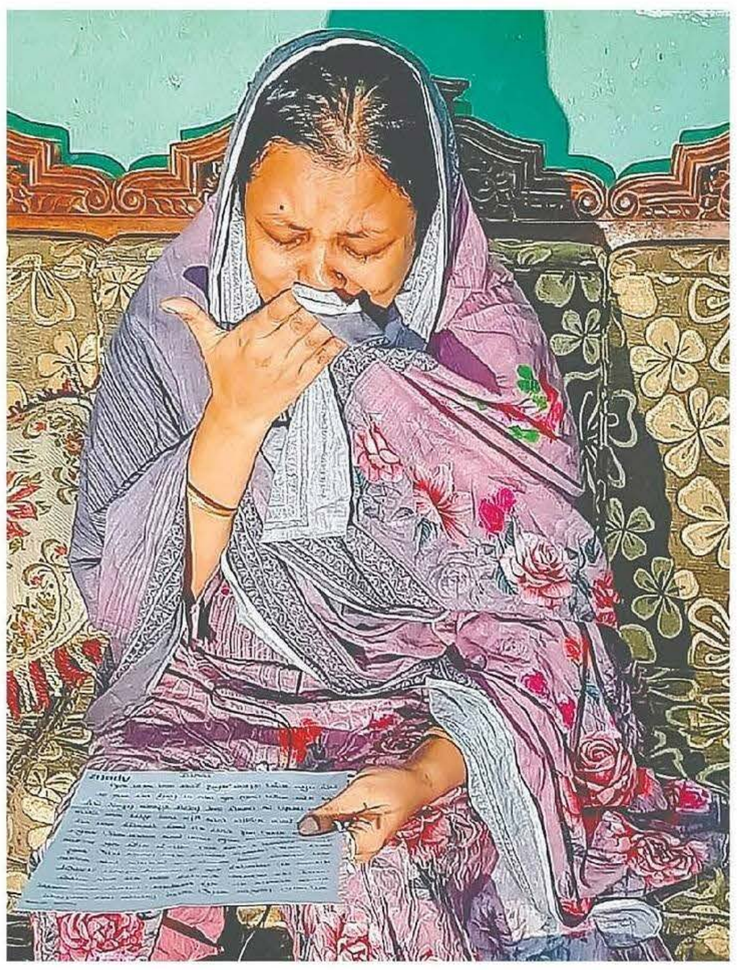

আনাসের চিঠি পড়ছেন মা সানজিদা খান। ২৭ আগস্ট ২০২৪। ছবি : লেখক

আমি নিজেও তো মা

মানসুরা হোসাইন, ঢাকা

বিশেষ প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*

কিশোর ছেলে আমিনুল ইসলামকে (আমিন) ঘুমে রেখে ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন ওবায়দুল ইসলাম। দিনটি ছিল ২১ জুলাই। যাত্রাবাড়ী এলাকায় ওই দিন কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ চলছিল। শনির আখড়ায় যাওয়ার পথে রিকশার যাত্রীরা আগেই নেমে গেলে কাজলার অনাবিল হাসপাতালের সামনে যান তিনি। একটু পর দুই ব্যক্তি এসে বললেন, এক কিশোরের গুলি লেগেছে, হাসপাতালে নিতে হবে। ওবায়দুল দেখতে পান, সেই কিশোর আর কেউ নয়, তাঁর ছেলে আমিনুল ইসলাম (আমিন)। মুঠোফোনে ওবায়দুল নিজেই ছেলের মা সেলিনা বেগমকে জানিয়েছিলেন, 'ছেলে মরে গেছে'। আমিনের বুকের বাঁ পাশে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

আগস্ট মাসের শুরুতে যাত্রাবাড়ীর দক্ষিণ দনিয়ায় এক কক্ষের ছোট ঘরটিতে বসে বাবা ওবায়দুল ইসলাম সেদিনের ঘটনা বলতে গিয়ে কেবলই ছেলের স্মৃতির কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর এই ছেলেই হতে চেয়েছিল ফুটবলার। ফুটবল খেলে এলাকা থেকে একটি ক্রেস্টও পেয়েছিল। বিছানায় রাখা ছেলের ক্রেস্টটির দিকেই বারবার অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিলেন তিনি। সেই চোখে ছিল কান্না, ক্রোধ আর আক্ষেপ।

আমিনুলের মা সেলিনা বেগম ছেলে মারা যাওয়ার পর মুঠোফোনে তোলা ছেলের কয়েকটি ছবি প্রিন্ট করে এনেছেন। বললেন, 'ছেলের মুখ তো আর দেখতে পারুম না। তাই ছবিগুলা ওয়াশ করে আনছি। কালা গেঞ্জি পরা যেকোনো ছেলেরে দেখলে মনে হয়, এ আমার ছেলে। আমার যে কী জ্বালা, তা খালি আমি বুঝি।'

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের ঘটনায় নিহতদের নিয়ে, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এবং আহতদের নিয়ে এ পর্যন্ত ২০টির বেশি প্রতিবেদন করেছি (বেশির ভাগই নিহতদের পরিবার ধরে)। প্রতিবেদন করতে গিয়ে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু সেদিন অফিসে ফেরার পথে বাবা কীভাবে ছেলের লাশ রিকশায় তুলছেন, সে দৃশ্যই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে গেন্ডারিয়ার সাধনা ঔষধালয়ের গলির বাসায় বসে কথা হয় শাহারিয়ার খান আনাসের মা সানজিদা খানের সঙ্গে। ৫ আগস্ট চানখাঁরপুলে গুলিতে মারা গেছে ১৬ বছর ৯ মাস বয়সী আনাস। আন্দোলনে যাওয়ার আগে আনাস তার মায়ের জন্য একটি চিঠি লিখে গিয়েছিল। মা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চিঠিটি পড়লেন। জানালেন, আনাসের বাবার সঙ্গে অটোরিকশায় বসে কোলে করে মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে ছেলের রক্তাক্ত লাশ নিয়ে বাসায় ফিরেছিলেন। আনাসের বুকের বাঁ পাশে গুলি লেগেছিল।

সন্তানহারা মা-বাবা যখন স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসেছেন, আলগোছে ছেলের পড়ার টেবিলের বই-খাতা, গিটার বা অন্য কিছু দেখাচ্ছেন, তখন মনের অজান্তেই চোখের সামনে নিজের দুই মেয়ের চেহারা ভেসে উঠেছে। আনাস বা সন্তান হারানো অন্য মায়ের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে আতঙ্কে শিউরে উঠেছি বহুবার। এমনও হয়েছে যে কোনো কোনো মা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছেন। মনে মনে ভেবেছি আমিও তো মা। আর সব মায়ের কান্না আসলে একই রকম।

নিহতদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলার পর অফিসে এসে প্রতিবেদন জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে মেয়েদের দেখে মনে শান্তি লেগেছে, একই সঙ্গে সন্তানহারা মায়েদের চেহারা মনে হয়েছে। আহা, মায়েদের সেকি কষ্ট!

বাসায় আমার ঘুম একটা ঠাট্টার বিষয়। কারণ, বিছানায় যাওয়ার আগে থেকেই নাকি আমি ঘুমাতে থাকি। সেই আমার চোখ থেকে কদিন ঘুম উধাও হয়ে গিয়েছিল। আবার ঘুম এলেও স্বপ্নে কেবল গুলি আর মৃতদেহ দেখি। ঘুম ভেঙে গেলে ভাবনায় আসে, ওই মা বা বাবা রাতে কি আর কখনো ঘুমাতে পারবেন?

অক্টোবরের শুরুতে যাত্রাবাড়ীতে গিয়েছিলাম ৫ আগস্ট গুলিতে মারা যাওয়া শাহাদাত হোসেনের বাসায়। মৃত্যুর সময় তার বয়স ১৪ বছরও হয়নি। শাহাদাতের মা শামসুন নাহার পুরো সময় প্রায় কোনো কথাই বললেন না। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কেবল নিজে থেকেই বললেন, 'জানেন, আমার ছেলেটা কী যে সুন্দর ছিল। পোস্টমর্টেমের সময় আমার এই সুন্দর ছেলের শরীরটাই কাটাকাটি করছে। আহা, না জানি আমার ছেলেটা তখন কত কষ্ট পেয়েছে।'

মনে মনে ভাবলাম, একেই বলে মা। গুলিতে ছেলে মারা গেছে তা জানার পরও এই মা ভাবছেন, মৃত শরীর কাটাকাটির সময়ও ছেলে ব্যথা পেয়েছে।

ঢাকা মেডিকেলে সেসব দিন

আহমদুল হাসান, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই, সন্ধ্যা সাতটা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চারটি নিথর দেহ পড়ে আছে। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানালেন, তাঁরা আর বেঁচে নেই। চারটি মরদেহই এসেছে যাত্রাবাড়ী থেকে।

ঠিক ১০ মিনিট পর এক তরুণী সেখানে এলেন। যে চারটি নিথর দেহ পড়ে আছে, সেগুলোর মধ্যে একটি তাঁর স্বামীর। তিনি জানতে চাইলেন, স্বামী বেঁচে আছেন কি না। সবাই নীরব। তরুণী বুঝে গেলেন, তাঁর স্বামী বেঁচে নেই। চিৎকার করে বললেন, 'আমার স্বামী মরতে পারে না। আমি লাশ নেব না।'

বিলাপ করতে করতে মূর্ছা যাচ্ছিলেন ওই তরুণী। একপর্যায়ে জানালেন, দুপুরে খাবার খাওয়ার পর স্বামীকে আম কেটে দিয়েছিলেন। সেই আম খেয়েই যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগ থেকে পুরান ঢাকার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামীর নাম কাজী নাজমুল হোসেন। পেশায় বেসরকারি চাকরিজীবী।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা করার কারণে এমন অনেক ঘটনায় স্বজনদের আহাজারি দেখেছি। পেশাগত কারণেই নিজেকে মানসিকভাবে শক্ত রেখে এ ধরনের ঘটনায় সংবাদ পরিবেশন করা আমার জন্য স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেদিনের ওই ঘটনায় আমি স্বাভাবিক থাকতে পারিনি। ওই নারী যখন তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে আহাজারি করছিলেন, আমি ভাবছিলাম, আমারও এমন পরিণতি হতে পারত অথবা হতে পারে। যদি এমন হয়, তাহলে আমার স্ত্রীও (তাকিয়া সুলতানা) নিশ্চয়ই এমন আহাজারিই করত।

সেদিন আমার মনে এই ভাবনা এসেছিল দুটি কারণে। প্রথমত, সেদিন আমার স্ত্রী তাকিয়া সকালে খাওয়ার পর আম কেটে দিয়েছিল। আমিও আম খেয়ে বাসা থেকে বের হয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, বাসা থেকে ১০০ মিটার দূরে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। সেই পথ পেরিয়ে আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে বা গুলিতে আমারও মৃত্যু হতে পারত। সেদিন আমার স্ত্রী আমাকে বাসা থেকে বের হতে দিতে চায়নি।

১৮ জুলাই ঢাকাসহ সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যাপক বলপ্রয়োগ করছিল। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে নির্বিচার গুলি চলেছে। দুপুর থেকে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের নিয়ে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স, অটোরিকশা ও রিকশা এসে থামছিল। মানুষগুলোর অধিকাংশই ছিলেন গুলিবিদ্ধ। তাঁদের কেউ মারা গেছেন, আবার কেউ ছিলেন আশঙ্কাজনক অবস্থায়। ওই দিন শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২৩ জনের লাশ এসেছিল।

১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুলাই—এই চার দিন ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে একইভাবে গুলিতে নিহত ও আহত মানুষকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আনা হয়েছিল। চার দিনই আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসা মরদেহ এবং আহত মানুষের খবর সংগ্রহ করেছি। আমি দেখেছি মানুষের আহাজারি। আমি নিজেও হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তবু মরদেহ গুনেছি।

একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হলাম ২০ জুলাই সন্ধ্যায়। পুলিশ কর্মকর্তা মইনুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী ছেলের লাশের খোঁজে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছোটাছুটি করছিলেন। নিহত ব্যক্তিদের তালিকায় ছেলের নাম আছে কি না, সেটি খুঁজতে থাকেন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে একজন তাঁকে পরামর্শ দেন লাশঘরে (জরুরি বিভাগের মর্গ) খুঁজে দেখতে। তিনি সেখানে গিয়ে ছেলের মরদেহ খুঁজে পান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে কাজী নাজমুলের লাশ দেখে আহাজারি করছেন তাঁর স্ত্রী। ১৮ জুলাই ২০২৪। ছবি : লেখক

মইনুল ইসলাম সন্তানের শরীরে শত শত ছররা গুলির চিহ্ন দেখে মুঠোফোনে অপর প্রান্তে থাকা এক ব্যক্তিকে বলতে থাকেন, 'একজনকে মারতে কত গুলি লাগে, স্যার।' পরে জানা যায়, অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা।

মৃত্যুভয় এবং উৎকণ্ঠার ২০ দিন

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে। আন্দোলনকারীদের দমন করতে শুরুতেই বলপ্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। ১৫ জুলাই দুপুরের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বর এলাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ বহিরাগতরা। ওই হামলার সময় সেখানেই ছিলাম। দেখেছি, কী নির্মমভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পেটানো হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়নি ছাত্রীদেরও।

১৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন জেলায় নিহত হন ছয়জন। ওই দিনই রংপুরে আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও মাঠে নামেন। এর মধ্যে মেরুল বাড্ডায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে শিক্ষার্থীরা অবরোধ করেন। পুলিশের বলপ্রয়োগের কারণে এই এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমার বাসা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ঠিক উল্টো দিকে একটি ভবনের সাততলায়। সেখান থেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে কী হচ্ছে, সব দেখা যায়। ১৮ থেকে ২১ জুলাই এবং পরে ৪ ও ৫ আগস্ট ওই এলাকায় ব্যাপক গুলি ছোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব দৃশ্য দেখে আমার স্ত্রী তাকিয়া সুলতানা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে আমাকেও বাইরে যেতে দিতে চাইত না। কিন্তু আমি তাকে নানা কৌশলে বুঝিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য বের হতাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাচ্ছিলাম ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ছোড়া গুলিতে বারান্দা, ছাদ, এমনকি ঘরে থাকা মানুষ গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন। আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, 'তুমি বারান্দায় যেয়ো না।'

১৯ জুলাই দিবাগত রাত থেকে সারা দেশে কারফিউ জারি করা হয়। ওই সময় কারফিউ পাস (অনুমোদনপত্র) নিয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। সেই সময় বাইরের পরিবেশ ছিল ভীতিকর।

১৮ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত বাসায় বসে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনের ঘটনাগুলো দেখে আমার স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দৃশ্যগুলো দেখে আমিও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এর মধ্যেই ২২ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত মৃত্যুর তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করি। আমার ও আমার স্ত্রীর মানসিক অবস্থা বিবেচনায় *প্রথম আলো* আমাকে কয়েক দিনের ছুটি দেয়।

৫ আগস্ট সকালে মেরুল বাড্ডায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনের এলাকায় পুলিশ ও ছাত্র-জনতার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছিল। সাড়ে ১০টার দিকে আমি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে আমার স্ত্রী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোনোভাবেই সে আমাকে বাইরে যেতে দেবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে অফিসের উদ্দেশে রওনা দিই। বেলা দুইটার পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-জনতার বিজয় হয়, তা বহু মানুষের রক্তের বিনিময়ে।

NORTH SOUTH UNIVERSITY
Center of Excellence in Higher Education

UNDERGRADUATE ADMISSIONS SPRING 2025

UNDERGRADUATE PROGRAMS

- BBA (Bachelor of Business Administration)
- BS in Economics
- BS in Computer Science & Engineering (CSE)
- BS in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Architecture
- BS in Civil & Environmental Engineering (CEE)
- Bachelor of Pharmacy (BPharm)
- BS in Biochemistry & Biotechnology
- BS in Microbiology
- BS in Environmental Science & Environmental Management
- Bachelor of Laws (LLB Hons)
- BA in English (Literature, TESOL & Language)
- BSS in Media, Communication, and Journalism (BSS MCJ)

Apply online
admissions.northsouth.edu

Application Deadline
November 13, 2024
Admission Test Date
November 16, 2024

GRADUATE ADMISSIONS SPRING 2025

GRADUATE PROGRAMS

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive Master of Business Administration (EMBA)
- MS in Economics
- Master in Development Studies (MDS)
- MS in CSE
- MS in EEE
- MA in English (Linguistics, Literature, TESOL)
- MS in Biotechnology (MSBTEC)
- MA in History and Asian Studies
- M.Sc. in Civil Engineering
- MPharm in Pharmacology & Clinical Pharmacy
- MPharm in Pharmaceutical Technology & Biopharmaceutics
- MS in Environmental Science and Managment
- Master in Public Health (MPH)
- Executive Master of Public Health (EMPH)
- Master of Laws (LL.M.)
- Executive Master in Policy and Governance (EMPG)
- Master of Science in Applied Mathematics and Computational Science (AMCS)

Application Deadline
November 27, 2024
Admission Test Date
November 29, 2024

Apply online
Website: apply.northsouth.edu

Bashundhara, Dhaka-1229 www.northsouth.edu +88-02-55668200

সরকার পতনের খবরে বিজয়ের আনন্দে জড়ো হয়েছে হাজারো মানুষ। নিউমার্কেট এলাকা, চট্টগ্রাম নগর। ৫ আগস্ট ২০২৪। ছবি : সৌরভ দাশ

মনে হচ্ছিল এখনই গুলি লাগবে

সুজয় চৌধুরী, চট্টগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রথম আলো

কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারপাশ। সাউন্ড গ্রেনেডে কান ঝালাপালা হওয়ার দশা। মুহুর্মুহু গুলিও চলছিল। শিক্ষার্থীরা দিগ্‌বিদিক হয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে কেউ অলিগলিতে ঢুকে পড়েন। কেউ আশপাশের ভবনের ভেতরে চলে যান। পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগের দিন ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড়ে গিয়ে এই দৃশ্যের মুখোমুখি হই। সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতা নানা দিক থেকে এসে সেদিন মোড়ে মিশেছিলেন। তবে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা একজোট হয়ে হামলা চালান। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গেও সংঘর্ষ হয়। পরিবেশ কার্যত ভীতিকর হয়ে ওঠে।

সংবাদ সংগ্রহের জন্য সেদিন সকাল আটটায় আমি নিউমার্কেট মোড়ে পৌঁছাই। তখন মোড়টি সুনসান। গাড়ি চলাচল বন্ধ। দোকানপাটের দরজায়ও তালা ঝুলছিল। পরিস্থিতি বুঝে মোড়ের এক পাশে দাঁড়াই।

সকাল নয়টার পরপর হই হই শব্দ। কিছুটা নিঃশব্দে মোড়ের বাঁ পাশে কোতোয়ালির দিকে এগিয়ে যাই। দেখলাম, একদল শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে নিউমার্কেট মোড়ের দিকে ধাবমান। তাঁদের মাথায় শক্ত করে বাঁধা জাতীয় পতাকা। মুখে স্লোগান, 'আমার ভাই মরল কেন/ জবাব চাই, জবাব চাই'; 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়/ বুক পেতেছি গুলি কর'; 'আমার খায়, আমার পরে,/ আমার বুকেই গুলি করে'।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তরুণেরা এসে নিউমার্কেট মোড়ে গিয়ে দাঁড়ান। এর পরের দুই ঘণ্টায় মোড়ে আর ঠাঁই নেই দশা হয়েছিল। চারদিক থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে মোড়ে এসে জমা হচ্ছিলেন ছাত্র-জনতা। কেউ একা, কেউ সদলবল প্ল্যাকার্ড হাতে এসেছিলেন।

আমরা ধারণা করতে পেরেছিলাম, ৪ আগস্ট নিউমার্কেট মোড়ে বড় ধরনের সংঘর্ষ হবে। ধারণা করার যুক্তিসংগত কারণও ছিল। সেদিন একই জায়গায় গণজমায়েত কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল আওয়ামী লীগ। হলোও তা-ই। বেলা ১১টা পর্যন্ত ছাত্র-জনতার স্লোগান, প্রতিবাদী গান, কবিতাপাঠ চলেছে। আমি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কয়েকজন সাংবাদিকের দেখা পেয়ে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলাম। আমাদের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সুজন ঘোষ সিটি কলেজের দিকে অবস্থান নেন। জ্যেষ্ঠ আলোকচিত্রী সৌরভ দাশ ও জুয়েল শীলও ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

নিউমার্কেট মোড় থেকে কয়েক শ মিটার দূরেই চট্টগ্রাম রেলস্টেশন। কয়েকজন সাংবাদিকসহ আমি স্টেশনের এক পাশে পৌঁছাই। সেখানে দাঁড়িয়ে মুঠোফোনে বিক্ষোভ শুরুর প্রতিবেদন লেখার কাজ করছিলাম সমানতালে। লেখার একফাঁকেই ককটেল বিস্ফোরণের বিকট শব্দ কানে এসে পৌঁছায়। এরপর স্লোগান থেমে গেল। ছন্দপতন ঘটল।

মোড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, মোড়ের পেছনে অমর চাঁদ সড়কে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। তারা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। ককটেলের বিস্ফোরণও ঘটানো হয়। ওই সময় অন্তত পাঁচজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তাঁদের মাথায় ছিল হেলমেট। বিরতিহীনভাবে ছাত্র-জনতার দিকে গুলি ছুড়ছিলেন অস্ত্রধারীরা।

মুহূর্তে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে যায় নিউমার্কেট মোড়। একপর্যায়ে পুলিশও ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। দিগ্‌বিদিক ছুটতে থাকেন দিশাহারা ছাত্ররা। কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন। ধরাধরি করে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হাসপাতালে।

কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখ বন্ধ হয়ে আসে। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

এর মধ্যে চোখ আটকে গেল একটি রিকশার দিকে। অমর চাঁদ সড়ক থেকে রিকশাটি আমতলার দিকে এগোচ্ছিল। রিকশায় শোয়ানো নিথর এক যুবক।

অস্ত্রধারীর কাছাকাছি...

হামলার মুখে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ নিউমার্কেটের পাশে হকার্স মার্কেট, রিয়াজউদ্দিন বাজার, তামাকুমুন্ডি লেনের বিভিন্ন বিপণিবিতানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আরেকটি অংশ স্টেশন সড়ক হয়ে কদমতলী দিকে চলে যায়। একটি অংশ চলে যায় লালদীঘি মোড়ে।

ছাত্র-জনতার যে অংশটি তামাকুমুন্ডি লেনের বিভিন্ন বিপণিবিতানে ঢুকে পড়েছিল, তাদের দিকে তেড়ে যায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। আমি তখন ওই লেনের পাশেই ছিলাম। একপর্যায়ে ছাত্র-জনতার ওপর আবার গুলিবর্ষণ শুরু হয়। আমি ঢুকে পড়ি একটা দোকানে। পরিস্থিতি বুঝে বেরিয়ে নিউমার্কেট মোড়ের এক পাশের পদচারী-সেতুর ওপর গিয়ে দাঁড়াই। সেখান থেকে মোটামুটি সব দেখা যাচ্ছিল। আগেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন জ্যেষ্ঠ আলোকচিত্রী সৌরভ দাশ। তিনি জানালেন, দুজন অস্ত্রধারী আশপাশেই আছেন। তাঁরা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু গুলি ছুড়ছিলেন। আমিও নজর রাখলাম।

বেলা পৌনে একটায় দেখলাম, কয়েকজন অস্ত্রধারী একটি বিপণিবিতানের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ছেন। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি গুলি এসে গায়ে লাগবে। কয়েকটা গুলি এসে পদচারী-সেতুর হাতলেও লেগেছিল, আমরা কাছেই ছিলাম।

গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত চোখ দিয়ে পড়ছিল পানি

ড্রিঞ্জা চাম্বুগং, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রথম আলো

১৫ জুলাই ২০২৪। সেদিন নির্ধারিত কোনো অ্যাসাইনমেন্ট ছিল না। নির্দেশনা ছিল, যেকোনো সময় প্রয়োজনে ঘটনাস্থলে ছুটতে হবে। বেলা দেড়টার দিকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় যেতে বলা হলো। অথচ অফিসেই থাকব ভেবে সেদিন স্যান্ডেল পরে কাজে বেরিয়েছিলাম। মোটরসাইকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম, বিক্ষোভ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ—এসবের মধ্যে কাজ করতে তো কোনো প্রস্তুতি নেই।

হাতিরপুল হয়ে কাঁটাবন মার্কেটে পরিচিত একটি দোকানে মোটরসাইকেল রেখে হেলমেট সঙ্গে নিলাম। পরিস্থিতি জানতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে থেকেই অবস্থান করা সহকর্মী আহমাদুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতেই দেখি, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা লাঠি, রড, স্টাম্প—এসব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভিসি চত্বর হয়ে টিএসসিতে গিয়ে দেখি, ততক্ষণে এলাকাটি ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীদের দখলে। তাঁরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এতে কেউ মাথায়, কেউ হাতে, কেউবা শরীরে আঘাত পেয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হচ্ছিল।

বিকেল চারটার দিকে জানা গেল, শিক্ষার্থীরা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে (এস এম) অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। সেখানে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালাতে দলবল নিয়ে রওনা হন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। টিএসসি থেকে শহীদ মিনার হয়ে এস এম হলের দিকে যাওয়া ছাত্রলীগের একটি মিছিলের পিছু নিই। হঠাৎ মিছিলের শেষ ভাগে থাকা ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী রিকশায় যাওয়া এক ছেলেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে মারধর করতে শুরু করেন। ছেলেটি ফুটপাতে শুয়ে পড়লে তাঁকে লাঠিসোঁটা দিয়ে মাথায় আঘাত শুরু করেন তাঁরা। তখন সেখানে থাকা সংবাদকর্মী ও ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে রক্ষা করেন। এক ফল বিক্রেতা নিজের পরনের শার্ট খুলে ছেলেটির মাথায় বেঁধে দেন। পরে ওই ফল বিক্রেতাই ছেলেটিকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান।

১৬ জুলাই ও ২ আগস্ট সায়েন্স ল্যাব এলাকায়, ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে, ২০ জুলাই মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে, ৩ আগস্ট গুলশানে এবং ৫ আগস্ট মোহাম্মদপুর ও বঙ্গভবন এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছি। রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়েছি প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহের কাজে।

অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি

সায়েন্স ল্যাব এলাকায় ১৬ জুলাই ও ২ আগস্ট দায়িত্ব পালন করেছি। সেদিন দুপুরে গ্রিন রোড থেকে কয়েকজন আন্দোলনকারীর সঙ্গে কথা বলে সায়েন্স ল্যাবের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। সায়েন্স ল্যাবে যেতেই একদল লোক আমার মোটরসাইকেল ঘিরে ধরেন। নানা প্রশ্ন আর নেতিবাচক কথা বলা হচ্ছিল। কেন এসেছি, কী কাজ করলাম, আন্দোলন নিয়ে কী লিখেছি—এসব। কিন্তু কিছুরই জবাব দেওয়ার বা আমার জবাব কারও শোনার মতো পরিস্থিতি ছিল না।

একপর্যায়ে কেউ কেউ আমাকে মোটরসাইকেল থেকে নামানোর চেষ্টা করেন, কেউ কেউ কাঁধের ব্যাগ ধরে টানাটানি করেন, বোতলের পানি গায়ে ঢেলে দেন। অনাকাঙ্ক্ষিত ওই পরিস্থিতি আন্দোলনে থাকা শিক্ষার্থীরা সামাল দেন। তাঁরা আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলে মোটরসাইকেল চালিয়ে ফিরে আসার সময় আমাকে লক্ষ্য করে পেছন থেকে ইটপাটকেল ছোড়া হয়।

হাসপাতালে মানুষের কান্না

বিক্ষোভকালে ছররা গুলি ও অন্যান্য আঘাতে চোখ নষ্ট হওয়া মানুষের খোঁজে ঢাকার হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরেছি। দেখেছি কত তরুণ চোখে ব্যান্ডেজ নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছেন, সেই ক্ষতিগ্রস্ত চোখ বেয়েই গড়িয়ে পড়ছে পানি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে গিয়েছিলাম দুই দিন—২৪ ও ২৬ জুলাই। প্রথম দিন সাড়ে ছয় বছর বয়সী রিয়া গোপের (গুলিতে নিহত) বাবা-খালার আহাজারি দেখে মনের অজান্তেই চোখের কোণে পানি জমে। দ্বিতীয় দিন সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদের বাবা নওশের আলীর কান্না দেখেছি।

৫ আগস্ট ছিলাম মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। সেদিন আড়াইটার দিকে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে গণভবনের দিকে অগ্রসর হয়। ততক্ষণে শেখ হাসিনা পালিয়েছেন।

শিক্ষার্থী মৃত্যুর প্রতিবাদ জানানো বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল, লাঠিপেটা। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ১৭ জুলাই ২০২৪। ছবি : সুমন ইউসুফ

আন্দোলনে গতি আনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

নুরুল আমিন, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*

কোটা সংস্কারের দাবিতে সারা দেশের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ বা সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করছিলেন শিক্ষার্থীরা। ১৯ জুলাই শুক্রবার বাড্ডা ও রামপুরা এলাকা থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলাম। পরে আরও কয়েক দিন একই এলাকার সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

আগের দিন ১৮ জুলাই সকাল থেকে রাজধানীর বাড্ডা ও রাস্তায় নেমে আসেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগে বাধ্য করার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে গতি ধরে রাখেন। ওই দিন বেলা ১১টার দিকে আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধের মুখে পুলিশ সদস্যরা কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান নেন। বেলা আড়াইটার দিকে র‍্যাবের হেলিকপ্টার এসে তাঁদের উদ্ধার করে। সব মিলিয়ে বাড্ডা-রামপুরা হয়ে ওঠে আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল।

এরই মধ্যে শুক্রবার দিবাগত রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি করা হলো। বন্ধ করে দেওয়া হলো ইন্টারনেট সেবাও। কারফিউ ভেঙে রাস্তায় নামবেন, এমন ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। কারফিউর প্রথম দিন ২০ জুলাই তাই সংবাদ সংগ্রহ করতে সকাল ৯টার দিকে বাসা থেকে বের হলাম। মনের ভেতর অজানা ভয় কাজ করছিল। আমার বাসা থেকে আধা কিলোমিটার দূরে মেরুল বাড্ডার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। হেঁটে যখন ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন গুলির শব্দ পাচ্ছিলাম। মূল সড়কে আসতেই দেখি, গুলিতে রক্তাক্ত এক শিক্ষার্থীকে ধরাধরি করে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সহপাঠীরা। রিকশায় রক্তের দাগ লেগে আছে।

সেই রিকশার পিছু নিয়ে এইমস হাসপাতালের সামনে গেলাম। সেখানে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা রামপুরা ব্রিজের ওপর থেকে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছেন। সেই গুলি এসে কারও মাথায়, কারও পায়ে লাগছে। তাঁদের সঙ্গে কথা শেষ করে অফিসে মুঠোফোন সংবাদ দিলাম। যখনই গুলির শব্দ শুনি, দেখি আন্দোলনকারীরা দৌড়ে গলিতে ঢুকে পড়ছেন। তাঁদের সঙ্গে আমি গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াই। প্রতিটি গুলির শব্দের পর কেউ না কেউ আহত হচ্ছেন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে ছুটছেন অন্যরা। এভাবে সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দেখলাম অন্তত ১০ জনকে গুলিবিদ্ধ হতে। এরপর গোলাগুলি থেমে গেল।

দুই সাংবাদিক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার ফুটপাত ধরে রামপুরা ব্রিজের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। এতক্ষণ পরিচয়পত্র পকেটে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেটা বের করে গলায় পরলাম। ব্রিজের ওপরে আসতেই দেখি, বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিজিবি সদস্য বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা ব্রিজের পাশে থাকা ট্রাফিক পুলিশের ছাউনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমাকে দেখে এক পরিচিত পুলিশ সদস্য এগিয়ে এলেন। আমাকে সাবধান করে বললেন, ‘সরাসরি গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাউকে আর মূল সড়কে আসতে দেওয়া হবে না। আন্দোলনকারী দেখলেই গুলি করা হবে।’ পুলিশ সদস্যের এ কথায় বুঝলাম, পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর দিকে এগোচ্ছে।

একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে পুলিশের দলটি সরে গেল। এর কিছুক্ষণ পর বনশ্রী আবাসিক এলাকার ভেতর থেকে আন্দোলনকারীরা একটি মিছিল নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ফটকের সামনে এসে অবস্থান নিল। বেলা একটার দিকে সেখান থেকে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু করলেন আন্দোলনকারীরা। একপর্যায়ে রামপুরা ব্রিজে দাঁড়িয়ে পুলিশ সদস্যরা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছুড়লেন। পরে বিজিবি সদস্যরা এগিয়ে গেলেন। তাঁরাও গুলি শুরু করলেন। এর আধা ঘণ্টা পরে আমার কাছে খবর এল, রামপুরার একটি হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ দুজনকে ভর্তি করা হয়েছে। একজন মারা গেছেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্রিজের তিন পাশ থেকে আন্দোলনকারীরা আবার রাস্তায় নেমে এলেন।

বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আমরা হাতিরঝিলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তখন আকাশে হেলিকপ্টার চক্কর দিতে দেখা গেল। এর কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়া শুরু হলো। আমি হাতিরঝিলের ভেতর দিয়ে আবার বাড্ডায় চলে এলাম। তখন মনে হচ্ছিল এই বুঝি গুলি এসে আমার শরীরে লাগবে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাত ১২টার দিকে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরেও গুলির শব্দ শুনছিলাম। সেদিন বাড্ডা ও রামপুরা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে কতজন আন্দোলনকারী আহত-নিহত হলেন, তার সঠিক হিসাব নিতে পারলাম না।

পরদিন ২১ জুলাই সকালে মেরুল বাড্ডায় আমার বাসা থেকে বের হলাম। মূল সড়কে যেতে পারলাম না। গলির মুখে দাঁড়িয়ে পুলিশ গুলি করছে। এর পরের দিনগুলো কখনো রামপুরা-বাড্ডা, কখনো রাজধানীর অন্যান্য জায়গা ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকলাম।

এভাবেই চলে এল ৫ আগস্ট। সেদিনও সকাল থেকে বাড্ডা এলাকায় ছিলাম সংবাদ সংগ্রহের জন্য। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত পুলিশকে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি ছুড়তে দেখলাম। পরে মানুষের ঢল দেখে পুলিশ বাড্ডা থানার ভেতরে গিয়ে অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। তারপরও পুলিশ গুলি ছুড়েছে। বিকেল চারটা থেকে কয়েক হাজার আন্দোলনকারী বাড্ডা থানা ঘিরে রাখলেন।

পরদিন ৬ আগস্ট সকালে গিয়ে দেখলাম, থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। থানা থেকে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। আমি মুঠোফোনে ছবি তুলে তথ্য নিয়ে কারওয়ান বাজারে অফিসে চলে গেলাম।

আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে গিছিল, হামলা, গুলি, হতাহত, কান্না, ছোটাছুটি ছিল প্রতিদিনের চিত্র। বাসা থেকে প্রতিদিন সকালে বের হতাম। ফোনে তথ্য দিতাম, অফিসে থাকা কোনো সহকর্মী সেই তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতেন। রাতে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাসায় ফিরতাম। পরের দিন কী হবে, সেই চিন্তায় অনেক রাত আমার নির্ঘুম কেটেছে। অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদক হওয়ায় আগেও আন্দোলন ও সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহে মাঠে থেকেছি; কিন্তু এত ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আগে কখনো যাইনি। জানি না সাংবাদিক হিসেবে আর কখনো এমন ভয়ংকর কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে কি না!

দুঃস্বপ্ন হয়ে এসেছিল দিনগুলো

শামসুজ্জামান, সাভার

নিজস্ব প্রতিবেদক *প্রথম আলো*

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতায় সাভার ও আশুলিয়া এলাকায় অর্ধশতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কয়েক শ মানুষ। তাঁদের কারও হাত, কারও পা কেটে ফেলতে হয়েছে। অনেকে এখনো হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ঘটে চলা এসব ঘটনা একজন সংবাদকর্মী হিসেবে খুব কাছ থেকে দেখতে হয়েছে। সেই দিনগুলো যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে এসেছিল আমার কাছে।

উত্তাল দিনগুলোর শুরু

সাভারে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল মূলত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৬ জুন। সেদিন সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালে আদালতের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন একদল শিক্ষার্থী। এরপর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন। সাভার ও আশপাশের এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তীব্রতা শুরু হয় ১৪ জুলাইয়ের পর। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হতে থাকে। তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর বাধা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে, মহাসড়কে নিয়মিত বিক্ষোভ চলতে থাকে। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আতঙ্কের এক রাত

১৫ জুলাই বিকেলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মিছিলে বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে হামলা চালান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে ওই রাতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। সেখানেও হামলা চালায় ছাত্রলীগ। শুরুতেই দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে আসা ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ছোড়া একটি পেট্রলবোমা এসে পড়ে আমার ঠিক সামনেই। রামদা হাতে থাকা হামলাকারীদের কিছু ছবি তোলায় মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে তা মুছে ফেলেন তাঁরা। ছাত্রলীগের হামলা থেকে বাঁচতে উপাচার্যের বাসভবন প্রাঙ্গণে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। সেখানেও সশস্ত্র হামলার মুখে আহত শিক্ষার্থীরা যে আর্তচিৎকার করেন, তা বাসভবনের ভেতর থেকে শোনেন উপাচার্যসহ অনেক শিক্ষক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ওই সময় ছাত্রলীগের ইটপাটকেল আর পেট্রলবোমার ভয়ে আতঙ্কিত শিক্ষার্থীদের রক্ষায় হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। একপর্যায়ে বিভিন্ন হল থেকে আসা শিক্ষার্থীদের পাল্টা ধাওয়ার মুখে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা চলে যান।

একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পুলিশ সদস্যদের ওপর চড়াও হন তাঁরা। তখন ক্যাম্পাসে কর্মরত এক সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে সারসুখী শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে তিন পুলিশ সদস্যকে নিরাপদে সরিয়ে নিলাম। ওই পুলিশ সদস্যদের ভয়ার্ত চোখ দেখে কষ্টও হয়েছিল সেদিন। এরপরই আবার সারসুখী হয়ে ওঠে পুলিশ। ওই রাতেই তাদের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল আর ছররা গুলিতে ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিক মেহেদী মামুন, আব্দুর রহমান খান, অধ্যাপক মোহাম্মদ লুৎফুল এলাহীসহ আন্দোলনকারী অনেকে আহত হন। উপাচার্যের বাসভবন প্রাঙ্গণে আহত অধ্যাপক আ স ম ফিরোজ-উল-হাসানকে সেদিন অসহায় শিশুর মতো পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তাঁকে তোলার সময় আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন।

এরপর থেকে সাভারের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ দমনে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সসায়ে সাভার ও আশুলিয়ায় আন্দোলনের সময় ছররা গুলিতে নিহত শিক্ষার্থী শাইখ আশহাবুল ইয়াগিনিকে পুলিশের সাঁজোয়া যানের ওপর থেকে ফেলে দেওয়া; পুলিশ ভ্যানে তুলে লাশে আগুন দেওয়া; হত্যার পর পুলিশ সদস্যদের লাশ উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা; শারীরিক প্রতিবন্ধী, শিশু, দিনমজুর, পোশাককর্মী, দোকানকর্মী নিহতের ঘটনাগুলো মানবিকতা ও মানবাধিকারের চরম বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরে।

ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন

আন্দোলনের সময় সাভার ও আশুলিয়ায় আমরা যাঁরা সংবাদ সংগ্রহের কাজ করেছি, তাঁদের প্রতিনিয়তই নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। ৫ আগস্টের আগপর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের বিক্ষোভকারীদের অনেকে ছবি তোলা, ভিডিও ধারণ করাসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতেও বাধা দেন। তাঁদের মারধরের শিকার হন কয়েকজন সাংবাদিক। সংবাদকর্মীর মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ তৎকালীন সরকার সমর্থকদের হামলার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লাঠিপেটা, মারধরের শিকার হতে হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ জুলাই দায়িত্ব পালনকালে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বেধড়ক মারধর করে পুলিশ। আত্মরক্ষার্থে এক পর্যায়ে দৌড়ে সেখানে থেকে সরে যাওয়ার সময় মামুন ও তাঁকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসা অন্য সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ছররা গুলি ছোড়ে পুলিশ। সাভারেও ৫ আগস্ট পুলিশের ছররা গুলিতে শরীরের বিভিন্ন অংশসহ ডান চোখে আঘাত পান সাংবাদিক সৈয়দ হাসিবুন নবী। আশুলিয়ায় আহত হন আরেক সাংবাদিক লোকমান হোসেন চৌধুরী। ইন্টারনেট বন্ধ থাকার সময়ে মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে অফিসে সংবাদ পাঠাতে ভীষণ বেগ পেতে হয়।

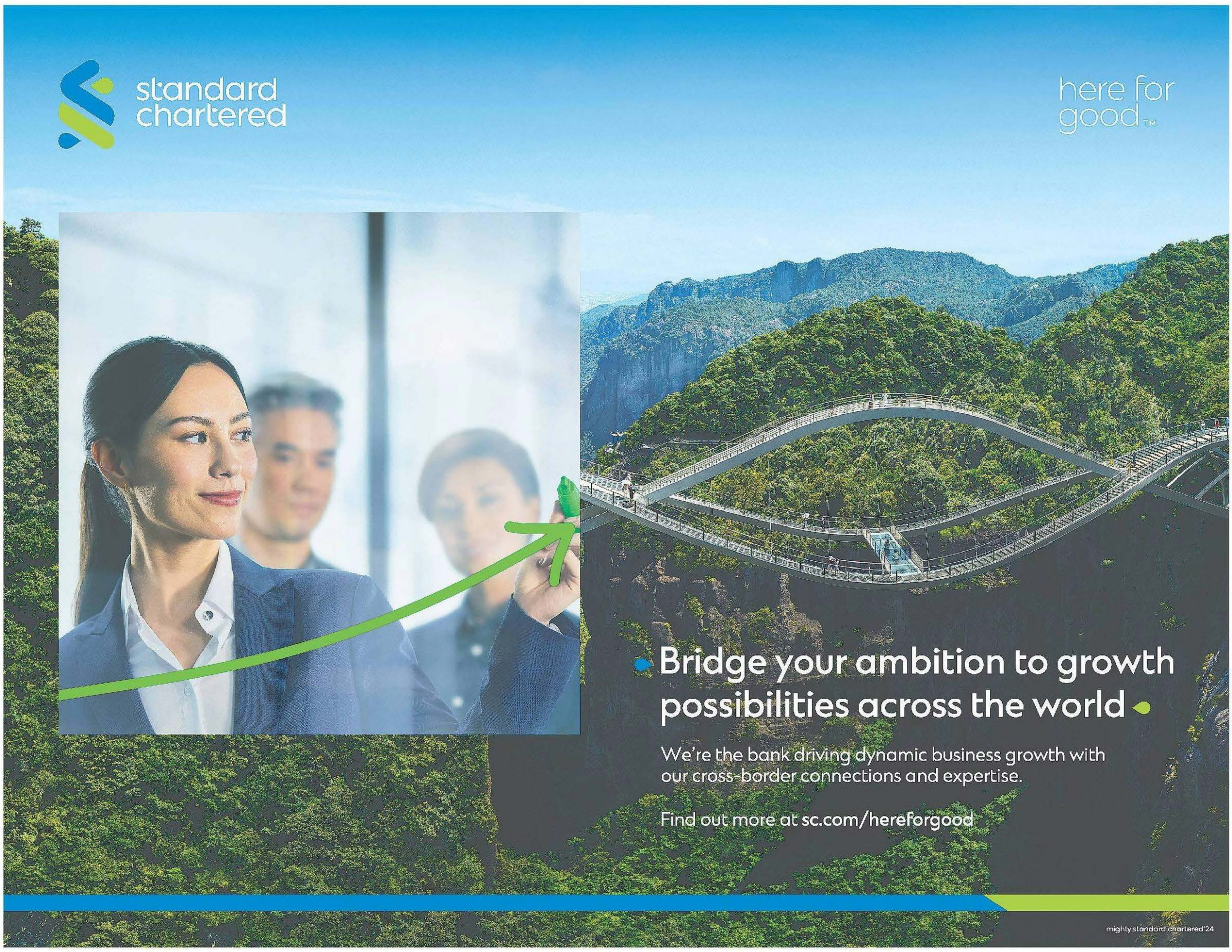

সবাইকে একত্র করতে পেরেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

আসিফ হাওলাদার, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রথম আলো

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতনের এক দফা—মাত্র ৩৬ দিনের আন্দোলনে স্বৈরতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। আন্দোলনটির সূতিকাগার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তখন *প্রথম আলোর* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক হিসেবে ৫ জুন থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত এ ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করার সুযোগ হয়েছিল আমার।

শুরুতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ' নামে আন্দোলন করছিলেন শিক্ষার্থীরা। পরে তা পরিচালিত হয় 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন লাখ লাখ সাধারণ মানুষ। সক্রিয়ভাবেযুক্ত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ডান ও বামের কোনো ভেদাভেদ ছিল না, গণ-অভ্যুত্থানে সবাই ছিলেন এক দাবিতে, সেটা ছিল শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ।

আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৫ জুন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিন হাইকোর্ট ২০১৮ সালে কোটা বাতিল করে জারি করা প্রজ্ঞাপনের একটি অংশ (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) অবৈধ ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা ফিরে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়। ২০১৮ সালের আগে সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা ছিল। শিক্ষার্থীরা তখন কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেদের বশে পুরো কোটাই বাতিল করে দেন।

এবার শিক্ষার্থীরা যখন শুধু সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছিলেন, তখন শেখ হাসিনা একটি বক্তব্য দেন। ১৪ জুলাই শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? (চাকরিতে কোটা) মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে, সেটা আমার প্রশ্ন।' তাঁর এই মন্তব্যের পর রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে আসেন ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা দাঁড়িয়ে যান শেখ হাসিনার মুখোমুখি অবস্থানে, যেটা এর আগের ১৫ বছরে হয়নি।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সেদিন রাতের মিছিলে ক্ষোভ থেকে প্রথমে 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার' বলে স্লোগান দেওয়া হয়। পরে স্লোগানে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়, বলা হয়, 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার'। ওই দিন মধ্যরাতে রাজু ভাস্কর্যে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। শিক্ষার্থীরা চলে যাওয়ার পর রাত তিনটায় ক্যাম্পাসে সহড়া দেয় ছাত্রলীগ-যুবলীগ।

শেখ হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে মানুষের ভেতরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল আগেই। ক্ষোভের সেই বারুদে স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা (১৫ জুলাই) এবং পুলিশের গুলিতে রংপুরের কোটা রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের শহীদ হওয়া (১৬ জুলাই)। আবু সাঈদকে গুলি করার ভিডিও চিত্র অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন।

আওয়ামী লীগ সরকার মানুষকে দমন করতে চেয়েছিল গুলি করে। কিন্তু মানুষ বুক পেতে দিয়েছেন।

> এ ধরনের সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই বিরল। বাংলাদেশের জন্য ৫২ বছর বছর পর সে সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিল। রাজু ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩ জুলাই ২০২৪। ছবি : সাজিদ হোসেন

স্লোগান উঠছিল, 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, সংস্কৃতিকর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পী, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, সাংবাদিক—সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার আর টিকতে পারেনি।

সেনাবাহিনীও ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অস্বীকার করে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান।

শুরুতে সরকার পতনের লক্ষ্য ছিল না

এই আন্দোলনের শুরুটা সরকার পতনের লক্ষ্য নিয়ে হয়নি। শিক্ষার্থীরা সরাসরি সরকারবিরোধী স্লোগানও দেননি। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তাঁদের আন্দোলনের গতিপথ নিয়ে, তাঁরা কী করবেন, কীভাবে দাবি আদায় করবেন, তা জানতে চেয়েছিলাম। যদিও সে কৌশল তখনো ঠিক হয়নি। তবে দাবির ব্যাপারে একটা অনড় অবস্থান ছিল।

আন্দোলনের শুরুর দিকে ছাত্রলীগ সংগঠিতভাবে বাধা দেয়নি। শুধু আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি চলাকালে তারা মধুর ক্যানটিনে অবস্থান নিত। তবে হল পর্যায়ে ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী আন্দোলনকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, হুমকি দিয়েছেন।

১৩ জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের দুই শীর্ষ নেতা 'ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পরদিন শেখ হাসিনার 'অপমানজনক' মন্তব্য পুরো পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

১৫ জুলাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের যখন বললেন, 'আত্মস্বীকৃত রাজাকারদের জবাব দিতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট', তখন থেকে ছাত্রলীগের নেতাদের বক্তব্যও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেদিনই ছাত্রলীগ আন্দোলনের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের হাজির করে। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ১৬ জুলাই রাতে রোকেয়া হল থেকে ছাত্রলীগ নেত্রীদের বিতাড়িত করেন।

এ ঘটনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৭ জুলাই দুপুরের মধ্যে ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলের নিয়ন্ত্রণ নেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ হিসেবে ছাত্রলীগ নেতাদের কক্ষ ভাঙচুর করা হয়।

যদিও অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশি অভিযান চালিয়ে ১৭ জুলাই সন্ধ্যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে বাধ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও হল ছেড়ে যাওয়ার সময় নীলক্ষেত ও শাহবাগ এলাকায় শিক্ষার্থীদের মারধর করেছিল ছাত্রলীগ। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনে ছাত্রলীগের প্রতি ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পর ঢাকায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সরকারি চাকরি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তেমন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু তাঁরা রাস্তায় নেমেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে। গড়ে ওঠে এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধ।

আন্দোলন সংগঠিত যেভাবে

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হওয়ার জন্য হল ও বিভাগভিত্তিক নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শুরুর দিকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও হলগুলোর পাঠকক্ষে গিয়ে চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যুক্ত হতে আহ্বান জানানো, গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি ইত্যাদি করা হয়। যেহেতু চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তাগিদও ছিল, ফলে আন্দোলনে আসার আহ্বানে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে আসেন, অনেকে আসেন প্রচারের ফলে।

প্রচারণার সবচেয়ে বড় উপায় ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। 'কোটা পুনর্বহাল চাই না', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ'সহ বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ, টেলিগ্রাম গ্রুপ প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করা হয়। ফলে দিন দিন আন্দোলনের পরিসর বাড়তে থাকে।

আন্দোলনের প্রথম দিকে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কম ছিল। ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে প্রচার বাড়ানো হয়। ছাত্রীদের মিছিলে আসতে সম্ভাব্য যেসব বাধা ছিল, সেগুলোর ব্যাপারে তাঁদের সাহস দিয়ে আশ্বস্ত করেন আন্দোলনের নেতারা। হল ও ব্যাচভিত্তিক ফেসবুক গ্রুপগুলোতে কর্মসূচির সময়, অর্থাৎ কখন, কোথায় জড়ো হতে হবে, তা বলা হয়। এই কৌশল কাজে দেয়। একপর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। ছাত্রলীগকে এড়াতে ছাত্রীরা আগেই হল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিতেন। সেখান থেকে কর্মসূচিতে যেতেন।

আন্দোলনের প্রধান নেতারা আন্দোলনের গতিমুখ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু দূর চিন্তা করেছিলেন। এর প্রমাণ মেলে নেতৃত্বের স্তরভিত্তিক পরিকল্পনায়। প্রথম স্তরের নেতারা গ্রেপ্তার বা গুম হলে দ্বিতীয় স্তর, দ্বিতীয় স্তর উপস্থিত না থাকলে তৃতীয় স্তর নেতৃত্ব দেবে—এমন পরিকল্পনা তাঁদের ছিল।

যেমন ইন্টারনেট বন্ধ থাকা ও সাসানের সারির অন্য সমন্বয়কেরা নিখোঁজ থাকার সময় সারজিস আলম, হাসনাত আবদুল্লাহ ও হাসিব আল ইসলাম তৎকালীন সরকারের তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে গভীর রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দেখা করে আট দফা দাবি জানিয়ে এসেছিলেন (১৯ জুলাই রাতে)। দাবির মধ্যে হত্যাকাণ্ডে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা, বিচার, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা ইত্যাদি ছিল। যদিও আবদুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন সমন্বয়ক ৯ দফা দাবি আগেই তুলে ধরেন। সেই ৯ দফার মধ্যে ছিল শেখ হাসিনাকে ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে জাতির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে মন্ত্রিসভা ও দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

২৬ জুলাই বিকেলে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ এবং আসিফের সঙ্গে থাকা আবু বাকের মজুমদারকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে জোর করে তুলে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে আরও তিন সমন্বয়ককে (হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম ও নুসরাত তাবাসসুম) তুলে নেয় ডিবি। হেফাজতে থাকা ৬ সমন্বয়ককে দিয়ে ২৮ জুলাই রাতে এক ভিডিও বার্তায় আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ানো হয়। এ ঘটনার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বের (আবদুল হান্নান মাসুদ, মাহিন সরকার ও রিফাত রশীদ) পক্ষ থেকে বলা হয়, অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। আন্দোলন চলবে। এর ফলে আন্দোলন নতুন করে গতি পায়।

আন্দোলনের নেপথ্যে যাঁরা

আন্দোলনে সচেতনভাবেই কাউকে একক নেতা বা মুখপাত্র করেনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যাঁরা পরিচিত মুখ বা যাঁদের নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আছে, তাঁদের সচেতনভাবে সামনে আসতে দেওয়া হয়নি। আন্দোলনটি শুরুতে গড়ে তোলেন মূলত 'গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি' নামের একটি সংগঠনের নেতারা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের সঙ্গে একসময় ছাত্ররাজনীতি করা কয়েকজন শিক্ষার্থী নতুন সংগঠনটি গড়ে তোলেন। এর আহ্বায়ক হন গণ অধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি আখতার হোসেন। সদস্যসচিব হন নাহিদ ইসলাম, যিনি এখন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা। ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

১২ পৃষ্ঠার পর

হন এখনকার অন্তর্বর্তী সরকারের আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আলোচনায় আসা আখতার হোসেন পরের বছর ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আখতার হোসেনের পাশাপাশি নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও শিক্ষার্থীদের অধিকারের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় থেকে আগে থেকেই পরিচিত মুখ ছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এখনকার আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ রেজিস্ট্রার ভবনে অনিয়ম ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি নিয়ে আন্দোলন করে আলোচনায় এসেছিলেন। সাবেক সমন্বয়ক সারজিস আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি হিসেবে আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি অমর একুশে হল সংসদের নির্বাচিত সদস্য (ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে) ও বিতার্কিক হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত ছিলেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে ২০২০ সালের শুরুতে ৫৫ দিন রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান করে পরিচিতি পান। তখন তিনি ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা।

আন্দোলনে শুরু থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক ও দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দুই শিক্ষার্থী মাহফুজ আলম ও আখতার হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের শুরু থেকেই রাজনৈতিক সাহিত্য পড়াশোনা, আড্ডাসহ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত থাকা মাহফুজ ছিলেন কার্যত ছাত্রশক্তির 'মস্তিষ্ক'। তিনি এখন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে আন্দোলনে একে একে যুক্ত হয় ছাত্রদল, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রপক্ষসহ বেশির ভাগ ছাত্রসংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রকাশ্য রাজনীতি ছিল না। কিন্তু শিবিরের নেতা-কর্মীরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।

আন্দোলনের শুরুতে ৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬৫ সদস্যের যে সমন্বয়ক দল গঠন করা হয়েছিল, ৩ আগস্ট তা বর্ধিত করে ১৫৮ সদস্যের করা হয়। অবশ্য মূল নিয়ন্ত্রণ ছাত্রশক্তির নেতাদের হাতেই ছিল। সংগঠনটি অনেকটা সচেতনভাবেই এই নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাঁরা ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই ছাত্রশক্তির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যখন চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলছিল, তখন তাতে যোগ দিতেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত সাত কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আন্দোলনে অংশ নিতেন।

সবার উদ্বেগের বিষয় ছিল, সরকারি চাকরিতে কোটা ফিরলে মেধাবীদের সুযোগ সংকুচিত হবে। দেশে চাকরির সংকট ও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে উচ্চহারে বেকারত্ব শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন করেছিল।

যোগ দেন শিক্ষকেরা

প্রতিবাদ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আগে থেকেই সক্রিয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদে নেমে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকেরা। তাঁরা শুধু বক্তব্য-বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, কর্মসূচিও পালন করছিলেন। তাঁদের ব্যানার ছিল 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক'।

১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশে'র ডাক দেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকেরা। সেই সমাবেশে অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাদা দলের শিক্ষকেরাও তাতে যোগ দেন। সমাবেশ থেকে শাহবাগ থানায় গিয়ে শিক্ষকেরা দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে আনেন।

২৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের ১২ জন শিক্ষক হাজির হন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ের সামনে। তাঁরা ডিবির হেফাজতে থাকা শিক্ষার্থীদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের দাবি জানান।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ

৫ আগস্টের পর ছাত্রলীগ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ শেখ হাসিনাকে দ্রুততম সময়ে কোটাব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু শেখ হাসিনা শুরু থেকেই এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন। শিক্ষার্থী আন্দোলনকে, এমনকি শিক্ষার্থীদেরই পাত্তা দিতে চাননি তিনি। উল্টো দমন-পীড়নের পথে হাঁটে তাঁর সরকার। অপমান আর নির্যাতনই একটা নিরীহ দাবিতে চলমান আন্দোলনের স্বরূপ পাল্টে দেয়।

প্রাথমিকভাবে ছাত্রশক্তির নেতাদের লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদের সংগঠনের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য কিছু 'ফেস' (মুখ) তৈরি করা। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের অনমনীয় ও দমনমূলক ভূমিকা এই আন্দোলনকে সরকার পতনের এক দফায় নিয়ে যায়। সরকারের চূড়ান্ত পর্যায়ের দমন-পীড়নে অতিষ্ঠ লাখ লাখ মানুষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে মাঠে নামেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়।

অভ্যুত্থানের পরে

সমন্বয়ক দল (টিসি) বিলুপ্ত করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে ২২ অক্টোবর। এর আহ্বায়ক করা হয়েছে হাসনাত আবদুল্লাহকে। অন্যদিকে আন্দোলনে থাকা তরুণেরা গঠন করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটি। ৬২ সদস্যের এই কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। নাগরিক কমিটি বলছে, তাঁদের স্বপ্ন, বাংলাদেশকে একটি 'শক্তিশালী রাজনৈতিক দল' উপহার দেওয়া।

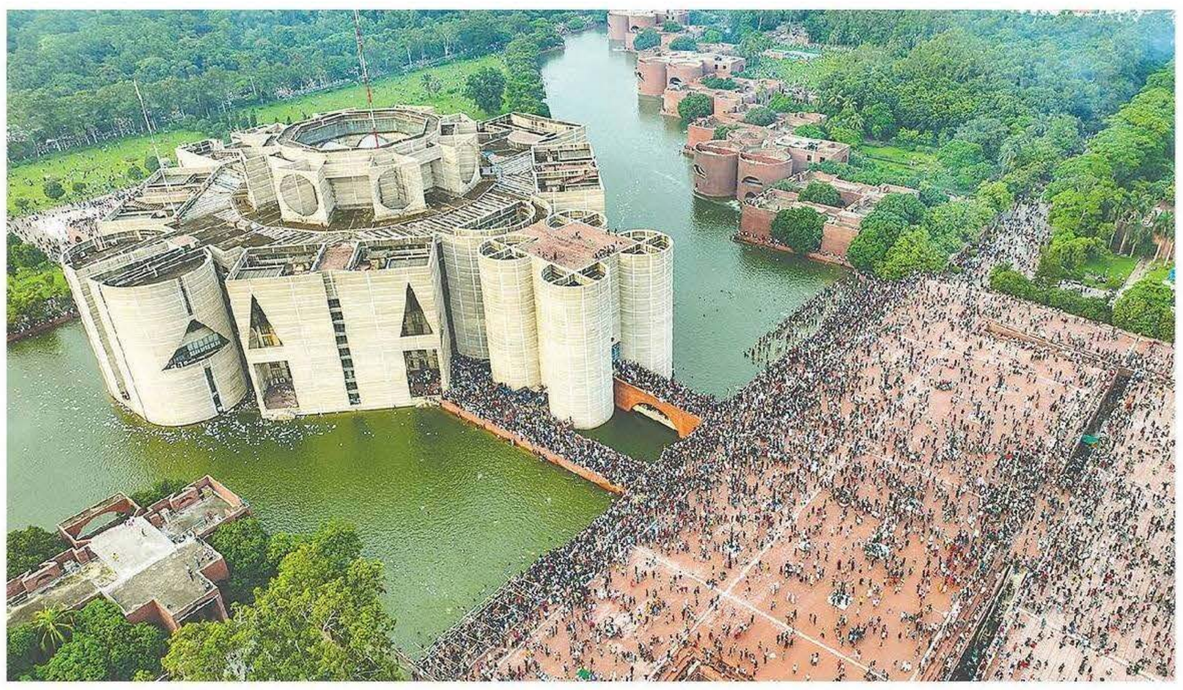

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জাতীয় সংসদ ভবনে জনতার ঢল। ৫ আগস্ট ২০২৪। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ। শাহবাগ, ঢাকা। ৪ আগস্ট ২০২৪। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

চারদিকে ভয়, তাঁরা অকুতোভয়

মোহাম্মদ মোস্তফা, ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *প্রথম আলো*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি কাভার করেছি ১১ জুলাই থেকে। আর শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয় ৫ আগস্ট। এই ২৬ দিন টানা মাঠে থেকে দেখেছি সব দৃশ্যপট।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে সরকার পতনের আন্দোলন ঘোষণার পর পরিস্থিতি কী হতে পারে, তা নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল। ৪ আগস্ট আমাকে দিনের কাজ (অ্যাসাইনমেন্ট) দেওয়া হয়েছিল শাহবাগ এলাকায়।

সকাল ১০টার দিকে দেখি শাহবাগ মোড় বেশ নীরব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাউকে দেখলাম না। কিছুক্ষণ পর সেখানে আওয়ামী লীগের ৪০ থেকে ৫০ জন নেতা-কর্মীকে দেখি। তাঁরা আন্দোলনকারী সন্দেহে পথচারীদের মারধর করেছিলেন। সাড়ে ১০টার দিকে টিএসসির দিক থেকে কয়েক শ যুবক লাঠিসোঁটা হাতে শাহবাগ মোড়ে এসে আওয়ামী লীগের লোকদের ধাওয়া দেন। ধাওয়া খেয়ে তাঁরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন। একপর্যায়ে বিএসএমএমইউতে গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়, কয়েকটি গাড়িও জ্বালিয়েও দেওয়া হয়।

এরপরই পুরান ঢাকা থেকে মানুষজন শাহবাগ মোড়ে আসতে থাকেন স্রোতের মতো। সবার হাতেই ছিল লাঠিসোঁটা। তাঁরা নানা রকম স্লোগান দিচ্ছিলেন।

বেলা দুইটার দিকে কিছুক্ষণ পরপরই কারওয়ান বাজার ও বাংলামোটরের দিক থেকে গুলির শব্দ আসছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কারওয়ান বাজার মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা বাংলামোটর মোড়ে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছেন।

আমি তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম পরীবাগ এলাকায়। কিছুক্ষণ পরপরই গুলিবিদ্ধ লোকদের রিকশায় করে শাহবাগ মোড়ের দিকে নিয়ে যেতে দেখি। তবে গুলিবিদ্ধ এত মানুষকে দেখেও আন্দোলনকারীদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ দেখিনি, দেখেছিলাম উল্টো নিরস্ত্র থেকেই অস্ত্রধারীদের ধাওয়া দিয়ে কারওয়ান বাজার এলাকাছাড়া করার দৃশ্য।

নির্বিচার গুলি হচ্ছে—এমন পরিস্থিতিতে মাঠে থেকে সাংবাদিকতা অন্য রকম এক অভিজ্ঞতা। আন্দোলনকারীদের কখন কার গায়ে এসে গুলি লাগবে, তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ দেখিনি। তবে নিজের মধ্যে কিছুটা সংশয় কাজ করছিল। এমন পরিস্থিতিতেই অলিগলি হয়ে পৌঁছাই কারওয়ান বাজার মোড়ে। এসে দেখি অস্ত্র হাতে আওয়ামী লীগের লোকেরা আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন। পিস্তল ও শটগানে বুলেট ভরে কিছুক্ষণ পরপর গুলি করছেন। গুলিতে কেউ পড়ে গেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।

বিকেল পাঁচটার দিকে আন্দোলনকারীরা আওয়ামী লীগের লোকদের ধাওয়া দিয়ে ফার্মগেটের দিকে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর কয়েক শ পুলিশ নিয়ে আবারও আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু এরপরও তাঁরা পেরে ওঠেননি। কারণ, আন্দোলনকারীরা ছিলেন অকুতোভয়। রাত আটটার দিকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

ডেটলাইন ৫ আগস্ট

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের দিন আমার অ্যাসাইনমেন্ট শাহবাগ মোড়ে। সকালে গিরপুরের বাসা থেকে মোটরসাইকেলে কারওয়ান বাজারে আসি। রিকশায় রওনা হই শাহবাগের দিকে। ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে গেলে সেনাসদস্যরা আটকে দেন। তাঁরা বলেন, মূল সড়ক হয়ে শাহবাগ মোড়ে যাওয়া যাবে না। চাইলে গলি দিয়ে যেতে পারি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় থেকে পশ্চিম দিকের গলিতে গিয়ে দেখি হাজারো মানুষ। ভিড় ঠেলে শাহবাগ মোড়ে গিয়ে দেখি কিছু সেনা ও পুলিশ সদস্যের অবস্থান।

বেলা একটার দিকে হঠাৎ বিএসএমএমইউর পশ্চিম পাশের গলি থেকে কয়েক শ মানুষ (আন্দোলনকারী) ছুটে আসেন শাহবাগ মোড়ে। পুলিশ তখন তাঁদের বাধা দিতে চাইলে সেনাসদস্যরা ঢাল হয়ে দাঁড়ান। শাহবাগ মোড়ে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন সেনাসদস্যদের বলতে থাকেন, 'পুলিশ আমাদের গুলি করবে, আমাদের বাঁচান, দেশটাকে বাঁচান।'

মুহূর্তের মধ্যেই টিএসসির দিক থেকে মিছিল আসা শুরু হয় শাহবাগ মোড়ে। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা শাহবাগ থানার সামনে চলে যান। মিছিল আসতে থাকে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে। ইতিমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে সেনাপ্রধান জাতির উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন। এর কিছুক্ষণ পরই খবর ছড়ায় শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ বলাবলি শুরু করেন, হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। পরক্ষণেই বন্ধ থাকা ইন্টারনেট সংযোগ সচল হয়। তাঁর দেশ ছাড়ার খবর জানাজানি হয়। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা।

গুলি করতে করতে তাঁরা ক্লান্ত

শুরুতে বলেছি, আমি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি কাভার করেছি ১১ জুলাই থেকে। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা ছিল আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের। বৃষ্টিতে ভিজেই ওই দিনের কর্মসূচিতে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেন। সেদিনই শিক্ষার্থীরা প্রথমবারের মতো পুলিশের অবরোধ ভেঙে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়েছিলেন।

১৯ জুলাইয়ের একটা ঘটনা বলি। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির সমাবেশ ছিল। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দলটিকে কর্মসূচি পালন করতে দেননি। সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল ও গুলি করে দলটির নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।

ওই দিন বিকেল চারটার দিকে প্রেসক্লাবের উল্টো পাশের সড়কে গিয়ে দেখি বিজিবি সদস্যরা রাস্তায় শুয়ে আছেন। জানতে চেয়েছিলাম রাস্তায় শুয়ে আছেন কেন। জবাব দিয়েছিলেন গুলি করতে করতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমার কাছে জানতে চাইলেন, পরিস্থিতি কেমন দেখেছি অর্থাৎ বিএনপির লোকজন আহত হয়েছে কেমন। বললাম, একজনের পায়ে গুলি লেগেছে। তখন বিজিবির এক সদস্য হেসে বললেন, 'আমার টার্গেট মিস হয়নি। আমি তো পা লক্ষ্য করেই গুলি করেছিলাম।'

মা-বাবা ফোন করতেন প্রতিদিনই

ছাত্র-জনতার এই আন্দোলন কাভার করতে গিয়ে হয়েছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। হঠাৎ ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় অসম্ভব বিড়ম্বনায় পড়েছি। এমনও হয়েছে পুরো নিউজ এসএমএস আকারে লিখে অফিসে পাঠাতে হয়েছে। না হয় ফোন করে দিতে হয়েছে। একদিকে কারফিউ, অন্যদিকে সংঘাত—এমন উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাজ করতে হয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গ্রামে থাকা মা-বাবা প্রতিনিয়ত ফোন করে খোঁজখবর জানতে চাইতেন। তাঁদের বলতাম, অফিস থেকে আমাকে নিরাপদ অ্যাসাইনমেন্ট (দিনের কাজ) দেওয়া হয়েছে। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বাস্তবতা হচ্ছে, ঝুঁকি নিয়েই জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আমাদের পেশাগত কাজ করতে হয়েছে। আমরা পিছপা হইনি।

'দ্রুত আসেন, লাইভ করতে হবে তো'

রাশেদুল আলম রাসেল, ঢাকা

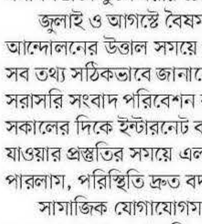

সহকারী বার্তা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

'রাসেল, কোথায়, বাসায় চলে গেছেন নাকি? ইন্টারনেট আসছে, দ্রুত আসেন, নিউজ লাইভ করতে হবে তো।' প্রথম আলো অনলাইন প্রধান শওকত হোসেন ভাই ফোন করে তাড়া দিলেন আমাকে।

৫ আগস্ট পরিস্থিতি থমথমে। সকাল সকাল অফিসে আসার পর চলছিল লাইভ নিউজের প্রস্তুতি। বেলা ১১টার দিকে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে 'ইন্টারনেট টোটাল শাটডাউন'-এর কথা জানানো হয়। অনলাইনে সংবাদসেবার সব কাজ তো ইন্টারনেট ছাড়া অচল। আমরা নিচে নেমে গেলাম। এমন সময় শওকত হোসেন ভাইয়ের সেই ফোন। দ্রুত অফিসের নির্দিষ্ট ফ্লোরে ফিরেই কাজ শুরু মানে লাইভ করার জোর প্রস্তুতি শুরু। অনেক সহকর্মী সেদিন বাসায় চলে গেলেও ইন্টারনেট সচল হওয়ায় আবার অফিসে এসে সংবাদের কাজ শুরু করেন। আর ওই কারফিউয়ে এবং ইন্টারনেট বন্ধের সময়ও আমরা ছাপা পত্রিকার কাজ চালিয়ে গেছি।

সেদিন (৫ আগস্ট) আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে চলে যাওয়া; গণভবন, সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (এখন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়) সাধারণ মানুষের ঢুকে পড়াসহ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় আগুন ও হামলার খবর আমরা পাঠকের কাছে লাইভ ব্লগের (লাইভ নিউজ) মাধ্যমে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে গেছি।

জুলাই ও আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল সময়ে পাঠককে হালনাগাদ সব তথ্য সঠিকভাবে জানানোর জন্য লাইভ ব্লগে সরাসরি সংবাদ পরিবেশন করতাম। গত ৫ আগস্ট সকালের দিকে ইন্টারনেট বন্ধের পর বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতির সময়ে এল 'নতুন খবর'। জানতে পারলাম, পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আকর্ষণের অন্যতম কারণ হলো ছবি, পোস্টে ও ভিডিওতে দ্রুত সাড়া (রিঅ্যাকশন) পাওয়া যায়। লাইক, কমেন্টস ও শেয়ারের কারণেই মানুষের আগ্রহ থাকে বেশি। মানুষ ডুবে থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। চলমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চটজলদি পাঠকের কাছে তুলে ধরতেই প্রথম আলো বিভিন্ন সময় নানা ঘটনার লাইভ করেছে।

তবে এবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় কোটা-বিতর্ক থেকে শুরু করে সরকার পতনের এক দফা পর্যন্ত এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনপ্রক্রিয়া পর্যন্ত আমরা টানা বেশ কিছুদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত লাইভ করেছি। পাঠকের সাড়াও পেয়েছি ব্যাপক। আগাস্টে প্রথম আলো অনলাইনের সব সেকশনের নিউজ ও লাইভ মিলিয়ে পেজভিউ ছিল ৩৫ কোটির বেশি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশ থেকে লাইভে কখনো একসঙ্গে ৫০ হাজারের মতো পাঠক পড়ছিল। দেশের বাইরে থেকে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাঠকের সাড়া ভালো ছিল।

লাইভের সাধ্য 'ইন্টারনেট টোটাল শাটডাউনের নির্দেশ'—ভিউ ২০ লাখ ১ হাজার ৭৯৫' (৫ আগস্ট), 'খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে'—ভিউ ১৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৮৯' (৬ আগস্ট), 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা', এ স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে : ড. ইউনূস'— ৮ লাখ ৪১ হাজার ৮৯২ (৮ আগস্ট), 'পাসপোর্ট পেলেন খালেদা জিয়া'—৫ লাখ ৫৬ হাজার ১৩০ (৬ আগস্ট), 'দিল্লিতে শেখ হাসিনা, যাবেন লন্ডনে : ইন্ডিয়া টুডে'—২ লাখ ৪ হাজার (৫ আগস্ট)।

লাইভে ৪ ও ৫ আগস্ট ছিল সবচেয়ে কঠিন সময়। কঠিন ছিল যাচাই-বাছাই করে সংবাদ প্রচার। 'দেশ ছাড়লেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা', 'ইন্টারনেট টোটাল শাটডাউনের নির্দেশ', 'গণভবনে ঢুকে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ', 'প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, হবে অন্তর্বর্তী সরকার : সেনাপ্রধান', 'দিল্লিতে শেখ হাসিনা, যাবেন লন্ডনে : ইন্ডিয়া টুডে', 'মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ, বন্ধ ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপও, সচল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট', 'রাত ৮টায় জাতীয় সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন', 'নতুন সরকারের শপথ ৮ আগস্ট'—এসব খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। মন্তব্যও করেছেন।

এখন মনে হতে পারে 'লাইভ নিউজ', 'লাইভ সংবাদ', 'সরাসরি খবর' আসলে কি? কোনো ঘটনার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সব সঠিক তথ্য পাঠকের কাছে বা সামনে তাৎক্ষণিক তুলে ধরা।

লাইভে বা সরাসরি সংবাদ প্রচারের সময় রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা *প্রথম আলোর* প্রতিনিধিরা নানা তথ্য হালনাগাদ করে ঢাকা অফিসে পাঠাচ্ছিলেন। আমরা নিজেদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আরও যাচাই-বাছাইয়ের পর পাঠকের সামনে তুলে ধরছিলাম।

আসলে এই পুরো লাইভ ব্লগ বা সরাসরি সংবাদ প্রচারে *প্রথম আলোর* সব কর্মীর সহায়তা ছিল। ওই যে সবাই মিলে 'আমরা' শব্দটির মতো।

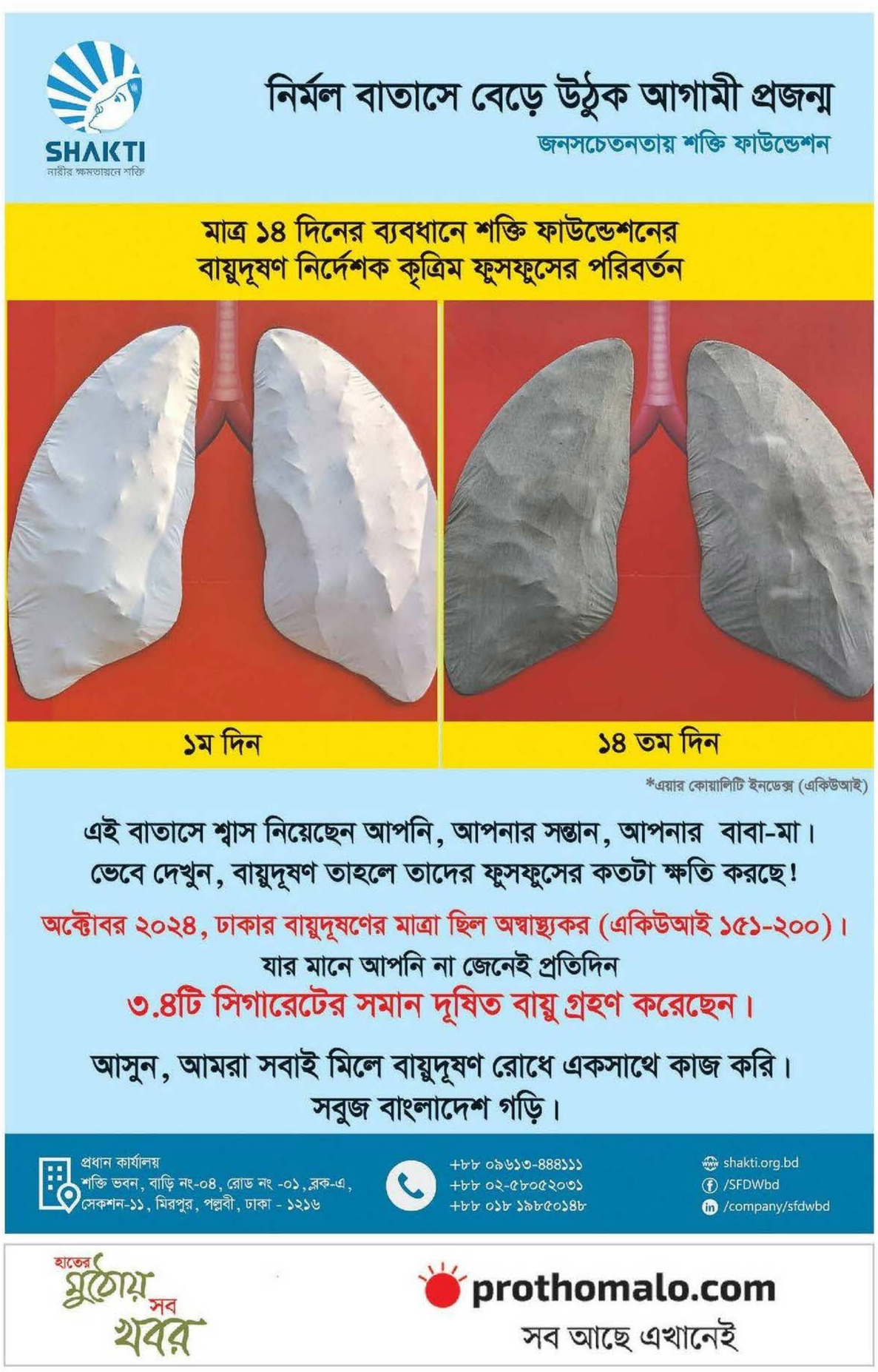

হাসপাতালে ‘সমন্বয়ক’ নাহিদের সঙ্গে

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা

পরামর্শক, বার্তা, *প্রথম আলো*

তখন খারাপ ঘটনার পর আরও খারাপ ঘটনা হুড়মুড়িয়ে ঘটে চলার দিনগুলো শুরু হয়ে গেছে।

১৯ জুলাই শুক্রবার রাত ১২টা থেকে দেশজুড়ে কারফিউ জারি হয়েছে, সেনা নেমেছে। ২০ জুলাই দুপুরের দিকে ‘সাংবাদিক’ পরিচয়ের ভরসায় শহর দেখতে বেরোই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টিএসসির সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একদল পুলিশ ও আনসার সদস্য বসে ছিলেন। ‘এমনি গল্প করব’ বলে বন্ধ টংদোকানগুলোর সামনে তাঁদের দায়িত্বশীল দুজনের সঙ্গে বসি। ক্রমে পুলিশ সদস্যটি ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির কিছু কথা বলেন, তবে ক্ষোভ ঝাড়েন বেশি।

আনসার ভদ্রলোক আশির দশকে এরশাদের আমল থেকে কাজে আছেন। নিচু গলায় বলেন, যা ঘটছে, এমন তিনি কখনো দেখেননি। আলাপ পাড়তে আমি বলেছিলাম, সব মিটে যাক, সবাই ভালো থাকুক। বিদায়কালে তিনি বললেন, ‘আপনি যেটা বলছেন, সেটা কঠিন হবে।... সহজে মিটবে না, এতগুলি মানুষ মরে গেছে!’ তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত মানুষের সংখ্যা রোজই বাড়ছে।

ওদিকে সেদিন আন্দোলনের প্রধান একজন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামের মা-বাবা মিন্টো রোডে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) দপ্তরের সামনে সারা দিন বসা। বাবা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ছেলেকে ডিবি ধরে এনেছে। পরদিন ২১ জুলাই দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্য অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন মুঠোফোনের খুদে বার্তায় আমাকে লিখলেন, নাহিদ ইসলাম ঢাকায় গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

কী করি? নাহিদের স্ত্রী মধুপোক নামের সম্পাদনা ও প্রকাশনাসংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। সেখান থেকে জানতে পারলাম, নাহিদ গণস্বাস্থ্যের পুরুষ ওয়ার্ডে আছেন। সে যাহোক, *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি শিশির মোড়লকে অফিস থেকে আসতে বলে আমি গণস্বাস্থ্যে গেলাম। বেলা তখন তিনটা। থমথমে ফাঁকা পথ। হাসপাতালের ভেতরে-বাইরে উটকো ভাবভঙ্গির কয়েকজন মানুষ চোখে পড়ল, তবে অন্য জনমানব বিশেষ নেই।

পুরুষ ওয়ার্ড তিনতলায়। সেখানে নাহিদের হদিস পেলাম না। উল্টো দিকে কাচের ঘরে ভাগ করা একটা বিভাগ (এখন সেখানে আইসিইউ)। একটামাত্র ঘরে কয়েকজনের ভিড়। এক পাশের শয্যায় চাদরে পা-ঢাকা ধূসর-সবজেটে টি-শার্ট পরা এক তরুণ।

জানলাম, তিনিই নাহিদ। ততক্ষণে শিশিরও হাজির। আমরা আগে নাহিদের আঘাতগুলোর ছবি তুললাম, তারপর তাঁর সঙ্গে কথা বললাম।

সেখানে ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের কর্মী ফাতেমা তাসনীমের সঙ্গেও কথা বললাম। নাহিদের মা মমতাজ নাহার, বাবা বদরুল ইসলাম ও স্ত্রী কিছু বলতে চাইলেন না।

নাহিদকে ফিরে পেয়েছেন, তাঁকে নিরাপদে সুস্থ করে ঘরে নিয়ে যেতে পারাটাই তখন স্বজনদের কাছে বড় ব্যাপার। এক বন্ধুর বাসা থেকে তাঁকে সাদাপোশাকের লোকজন তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৯ জুলাই শুক্রবার গভীর রাতে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন

সমন্বয়ক নাহিদকে তুলে নিয়ে নির্যাতন

ওদিকে পুরুষ ওয়ার্ডেও আহত দুজন আন্দোলনকর্মী ছিলেন। আমরা তাঁদের সঙ্গেও কথা বললাম। নাহিদসহ সবার নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। বেরোনোর মুখে *দ্য ডেইলি স্টার*-এর দুজন সাংবাদিককে দেখলাম। পরে জানলাম আলোকচিত্রী শহিদুল আলমও গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রতিবেদন করেছেন, লিখেছেন। এমন সব খবর কি আর ধামাচাপা দেওয়া যায় কখনো?

তো অফিসে ফিরে শিশির ঝটপট প্রতিবেদন লিখে ফেললেন। আমি সম্পাদনা করলাম। রিপোর্টিং বিভাগের প্রধান টিপু সুলতান, বার্তা সম্পাদক রাজীব হাসানসহ আরও কয়েকজন খুঁটিয়ে পড়লেন। কিছু তথ্য জোগাড় করে যোগ-বিয়োগ করলাম।

রাতে আন্দোলনের আরও তিন সমন্বয়ক নাহিদকে দেখতে যান, সবাই মিলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সেই অংশটুকু প্রথম প্রতিবেদনের শেষে যুক্ত হয়। পালা-দৌড়ের মতো কিছু প্রতিবেদনের কাজ অনেকজনকে এগিয়ে নিতে হয়।

ইন্টারনেট ছিনতাই-হওয়া সেই সময়ে ওয়েবসাইট বন্ধ ছিল। ২২ জুলাই পত্রিকার প্রথম পাতায় ‘কোটা সংস্কার আন্দোলন : সমন্বয়ক নাহিদকে তুলে নিয়ে নির্যাতন’ শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

প্রতিবেদনের শুরুটা ছিল এমন, ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলামের বাঁ উরু, দুই বাহু আর কাঁধে বড় জায়গাজুড়ে রক্ত জমে তামাটে হয়ে আছে। শরীরে মারের চিহ্ন নিয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ছিলেন তিনি।’

নাহিদ আমাদের বলেছিলেন, তাঁকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে ৩০-৩৫ মিনিট দূরে একটা ঘরে নিয়ে ঢোকানো হয়েছিল। কয়েকজন লোক তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ ও মানসিক নির্যাতন করেন। তবে সেসব কথাবার্তা নাহিদ সে মুহূর্তে বলতে চাননি।

একটা সময় খুব সম্ভব রড দিয়ে তাঁকে পেটানো হয়। তিনি জ্ঞান হারান। এ এমন পেশাদার মার, যা তীব্র যন্ত্রণা রেখে যায় কিন্তু হাড় ভাঙে না, পোশাকের আড়ালে থাকে।

নাহিদ বলেছিলেন, জ্ঞান ফিরলে দেখেন বড় রাস্তার পাশে পড়ে আছেন। সাইনবোর্ড দেখে বোঝেন তিনি পূর্বাচলে। তারপর অটোরিকশায় বনশ্রী এলাকার বাসায় যান, দুপুরে হাসপাতালে আসেন।

অন্য সমন্বয়কদের সঙ্গে তখনো আলোচনা হয়নি, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে *প্রথম আলোকে* আন্দোলন বিষয়ে নিজের অনুধাবনের কথা বলেছিলেন নাহিদ। তখনকার ভয়ের পরিস্থিতিতে প্রতিবেদনটি খুব সতর্কভাবে দাঁড় করাতে হয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁর সাক্ষাৎকারটি শুনে দেখছি, মূল কথাগুলো বাদ পড়েনি।

সেদিনও লক্ষ করেছিলাম, আজও শুনতে পাচ্ছি, নাহিদ ওই অবস্থাতেও ধীর, পরিমিত ও যুক্তিসংগতভাবে কথা বলেছিলেন। তাঁর গলায় কোনো অস্থিরতা বা ভয় ছিল না।

পরদিন জেনেছিলাম, তিনি নিরাপদ জায়গায় সরে গেছেন। সেই জায়গাটি যে আসলে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালেই ছিল, তা বুঝতে পেরেছি ২৬ জুলাই যখন নাহিদ ও আরও দুজন সমন্বয়ককে সেখান থেকে ডিবির হেফাজতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেদিন আবারও সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ ছিলাম। নাহিদের স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন; সঙ্গী ফাতেমা ভয় করছিলেন, তাঁদেরও তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে নাহিদের মা ও ফুফু এলেন।

ঘরে ফিরলাম ছন্নছাড়া এক বিষাদ, অনিশ্চয়তা ও ভয় লেপটে যাওয়া মন নিয়ে। যখন যেমন সময় তিনি দেখেন, সাংবাদিকের মনে সেটা তো গেঁথে থাকেই।

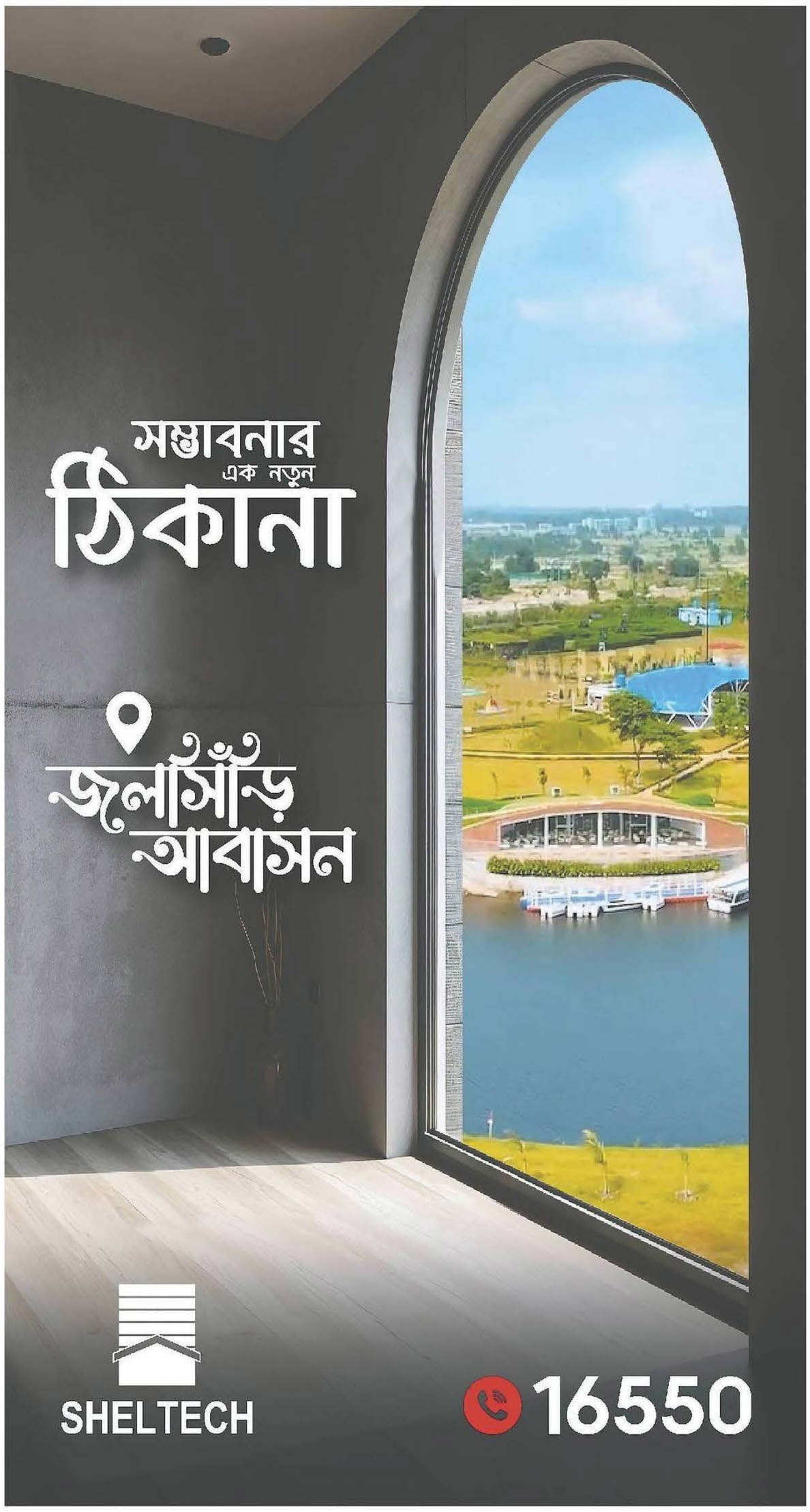

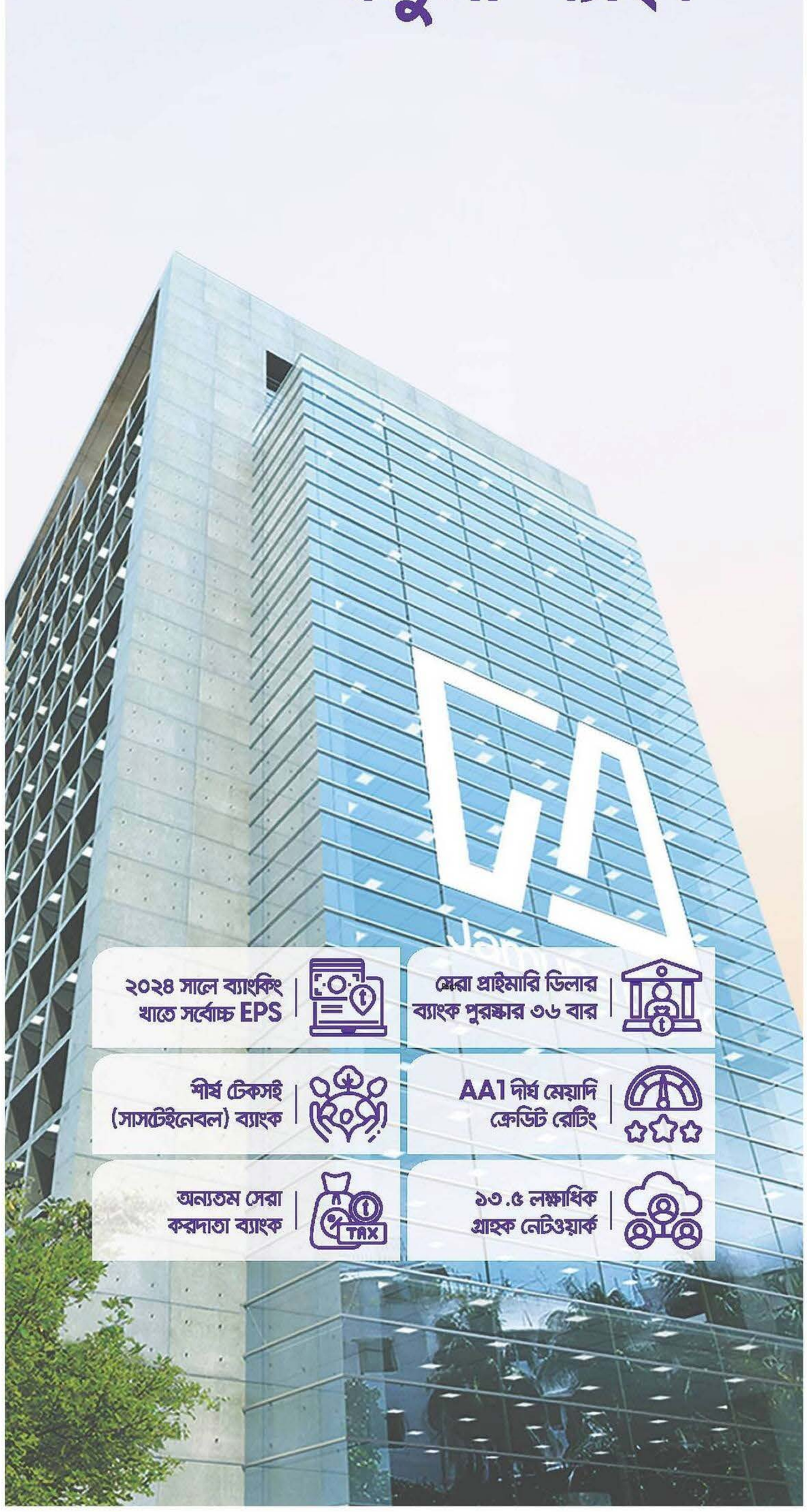

ছবি তোলার মুহূর্ত

প্রথম আলোর আলোকচিত্রীদের তোলা ছবিগুলো প্রকাশিত হয়েছে একাধিকবার। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীক এই ছবিগুলো। ঝুঁকিপূর্ণ সেই সময়ে ছবি তোলার মুহূর্তের কথা লিখেছেন আলোকচিত্রীরা

১৫ জুলাই
এক হাতে তোলা ছবি
দীপু মালাকার

আমরা কয়েকজন গণমাধ্যমকর্মী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের সামনের মাঠে অবস্থান নিয়েছি। আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মুখোমুখি। সেই ছবি তুলছিলাম। দুই পক্ষই ইটপাটকেল নিক্ষেপ করছিল। হঠাৎ বিজয় একাত্তর হলের ভেতর থেকে একটি বড়সড় ইটের টুকরা এসে আমার বাঁ হাতে লাগে। হাতটি নামিয়ে দেখলাম, কবজির ওপরে বেশ বেশ বড় আঘাত লেগেছে। গলগল করে রক্ত পড়ছে। এক সহকর্মী তাঁর সঙ্গে থাকা স্যানিটাইজার আমার আঘাতপ্রাপ্ত অংশে লাগিয়ে দেন।

তখনো চলছে ছাত্রলীগের তাণ্ডব। হকিস্টিক, রামদা দিয়ে চড়াও হয়েছেন আন্দোলনকারীদের ওপর। ব্যথা ভুলে আবারও শুরু করলাম ছবি তোলা। একপর্যায়ে বিকেল পৌনে চারটার দিকে আন্দোলনকারীরা পিছু হটে ফুলার রোড ও নীলক্ষেত মোড়ের দিকে ছুটতে থাকেন। তখন সামনে যাঁকে পান, তাঁকেই মারধর করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় মল চত্বরে আন্দোলনে যুক্ত অনেক ছাত্রীও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মারধরের শিকার হন। আমার হাতের ব্যথাও তীব্র হচ্ছিল। মল চত্বরের সড়ক বিভাজকে দাঁড়িয়ে এক হাতেই ছবি তুলছিলাম। তখন পালিয়ে যাওয়ার সময় দুজন ছাত্রীকে মারতে উদ্যত হচ্ছিলেন এক ছাত্রলীগ কর্মী। ছাত্রী দুজনের চোখেমুখে ছিল আতঙ্ক। এক হাতেই তুলে ফেলি ছবিটা।

১৯ জুলাই
ছেলেটি বেঁচে ছিল
তানভীর আহম্মেদ

হানিফ ফ্লাইওভারে যাত্রাবাড়ীতে নামার প্রান্তে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সড়কে পড়ে আছেন এক আন্দোলনকারী। একদিকে পুলিশ গুলি ছুড়ছিল, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের ইটপাটকেল। এর মধ্য দিয়েই ছেলেটার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি। কাছে যাওয়ার পর তাঁকে দেখে মনে হয় মারা গেছেন। তাই সরিয়ে নিতে পুলিশ সদস্যদের বলতে থাকি, 'ভাই, এখানে একজন মানুষ পড়ে আছেন।'

আমার গলার আওয়াজ শোনার পর সড়কে পড়ে থাকা ছেলেটি হাত তোলেন। তাঁর সেই মুহূর্তের ছবি তুলতে তুলতেই আমি আবারও বলি, 'ভাই, উনি এখনো বেঁচে আছেন, তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।' পরে আহত ছেলেটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

৩১ জুলাই
পুলিশের ভ্যানের সামনে
শুভ্র কান্তি দাশ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর জাস্টিস' নামের পদযাত্রা কর্মসূচি ছিল। হাইকোর্টের সামনের দিকে পুলিশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করে। আটক এক শিক্ষার্থীকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন আরেক শিক্ষার্থী। আটক শিক্ষার্থীকে পুলিশ ভ্যানে তোলার পর এক শিক্ষার্থী ভ্যানটির সামনের দিকে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েন। আমি সেই ছবি তুলতেই দেখি নারী পুলিশ সদস্যরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। এই আন্দোলনকারীর নাম ছিল নুসরাত।

৩১ জুলাই
বাসায় না গেলে বড় ক্ষতি হবে
সাদ্দাস হোসেন

খুলনার সিটি কলেজের সামনে তখন সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। রয়েল মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিজন ভ্যানে ছাত্রদের ধরে এনে ওঠানো হচ্ছিল দেখতে পেয়ে এগিয়ে যাই। ঠিক তখনই প্রিজন ভ্যানের জানালা থেকে এক তরুণী সাংবাদিক দেখে বলতে থাকেন, বাসায় না গেলে বড় ক্ষতি হবে তাঁর।

বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। আমি তাঁকে কী বলব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে অসহায় তরুণীর ছবিটা তুলি।

ক্রোড়পত্র সমন্বয়কারী : রাজীব আহমেদ; সহযোগিতায় : সজীব মিয়া; অঙ্গসজ্জা : আনিসুজ্জামান সোহেল, গ্রাফিকস : আমিনুল ইসলাম

Bringing Motion to Life

YANMAR
PIONEER IN HARVESTING & TRANSPLANTING TECHNOLOGY

SONALIKA | ACI Power Tiller
1/3 OF LAND CULTIVATED BY SONALIKA TRACTOR & ACI POWER TILLER

YAMAHA Revs Your Heart
LEADER IN PREMIUM SEGMENT WITH WORLD CLASS AFTER SALES SERVICE & COMMUNITY BASED MARKETING

ACI Motors
17 Years of Customer Centric JOURNEY

Water Pump | Diesel Engine
RELIABLE WATER SOLUTION FOR MILLIONS OF PEOPLE

FOTON
FASTEST GROWING COMMERCIAL VEHICLE IN BANGADESH

ACI Power Solution | KOBELCO
LEADER IN BRAND NEW SEGMENT OF CONSTRUCTION EQUIPMENTS & YOUR RELIABLE POWER BACKUP

CALL FOR QUERY 16533

CEAT Tyres Ensure Ultimate Safety
LIQUI MOLY is Germany's Number 1 Motor Oils Brand
SMART TOOLS & ACCESSORIES
STUDDS | SMK HELMETS
YAMAHA Music
ACI Power Thresher
Post-Harvesting Solution

SCAN FOR MORE INFO!